প্রেমেন্দ্র মিত্র

# ভৌতিক



# অমনিবাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সন্ধানী ॥ ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :
হরিগোপাল বসাক
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বাংলা ফাল্গুন ১৩৯০
ইংরাজী মার্চ ১৯৮৪

প্রচ্ছদ-কুমারঅজিত

মূল্য : বারো টাকা

মূদ্রনে :
শিশির প্রামাণিক
বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮২, এ, পি, সি, রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯

## ভূত কেন ?

ভূতের গল্প ব্যাপারটা আসলে ভয় নিয়ে খেলা করবার একটা মজা। আমরা রাগ হিংসা ঘৃনাভালবাসা দয়ামায়ার মত সবরকম মনের ভাবনিয়ে উপভোগ করারমত গল্প যখন বানাই তখন ভয়টাকেইবা বাদ দেব কেন ?

ভয়—তাও যেমন তেমন-গুণ্ডা, বদমাস, খুনে, ডাকাত, বাঘ, ভালুক সাপের—ভয়ের মত সাধারণ ভয় নয়, বুদ্ধির নাগালের বাইরে অদ্ভুত গা-ছম-ছম-করা থেকে হঠাৎ বুকের ভেতরটা-খালি-করে দেওয়া শিরদাঁড়া দিয়ে-হিমেল স্রোত বইয়ে সারা শরীর অবশ-করে-দেওয়া যে ভয় তা নিয়ে গল্প বানানো বড় সোজা কথা নয়।

এ তো আর আগেকার দিনে ভূতের গল্প বলতে যা বোঝাত সেই অন্ধকার রাতে অজ পাড়াগাঁয়ের জলাবাদার ধারে ঝাঁকড়ান কোন আশ-স্যাওড়া গোছের গাছ থেকে লম্বা কঙ্কাল হাত বাড়িয়ে নাকিসুরে—"কে যাঁস্ ? মাঁছ দিয়ে যাঁ নঁইলেঁ-" বলে শাসানো ভৌতিক কাহিনী নয়। নতুন এক ভয় বিস্ময় বিহ্বলতা মেশানো বাস্তবতা সীমান্ত ছোঁয়া এ সব কাহিনীভিন্নমশলায় কল্পনার ভিন্নবুননের কেরামতিতে তৈরীহয়।

চেষ্ঠা করলেই গুনীদের হাতেও এসব গল্প সব সময়ে যে উৎরোয় তা নয়। কিন্তু যখন উৎরোয় তখন সে গল্প থেকে যা পাই তা ভয়ের চেয়ে বেশী কিছু-যেমনপেয়েছি রবিঠাকুরের 'ক্ষুদিত-পাষান' কি 'মনিহারা'-গল্পে।

এই ভৌতিক অমনিবাস এ জীবনের নানা সময়ে লেখা যে কটি ভূতের গল্প আছে সেগুলির মধ্যে প্রথম যেটি লিখি সেটি রচনার পেছনে কি ভাবনা কাজ করেছিল তা এখানে বোধহয় একটু বলা যায়।

গল্পটির নাম কলকাতার গলিতে। আর আমার ভূতের গল্প লেখার পেছনের ভাবনা কোন দিক দিয়ে যে একটু আলাদা তার ইঙ্গিতও গল্পটির মধ্যেই আছে।

আঁদাড়ে পাঁদাড়ে শকুন-কাঁদাশ্মশানেমশানে ভাগাড়ে নয়, এই মানুষ গিজ-গিজ কলকাতা শহরেই বুকের ভিতরটা হিম করে দেওয়া হাওয়ার ঝাপটা হঠাৎ লাগানো যায় কিনা তাই দেখাই ছিল আমার চেষ্টা।

তবু, এই—ভয়টাইত সব নয়।

তা ছাড়িয়ে এ জাতের গল্পের যা শেষ কথা, আমার এই অমনিবাস এর কাহিনী গুলিতে মামুলী গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ভয়ের চেয়ে সেই উপরি কিছু আছে কিনা, সে বিচার আমার পড়ুয়ারাই করবেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

**এতে যে সব লেখা আছে**

# গল্পের শেষে

বর্ষাকাল, সুতরাং বৃষ্টি তো হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্তিরেও তার বিরাম হবে না জানলে আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই পাড়াগাঁয়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না।

জায়গাটা যে এমন পাণ্ডববর্জিত দেশ তাই-বা কে জানত! খবরের কাগজে নসীপুরে 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের' নাম দেখে ভবেশ একটা এন্টি করে দিয়েছিল। ভবেশ আমাদের 'দি আন্‌বীট্‌ন ইলেভ্‌ন' ছ-মাসের পরমায়ুতে এ পর্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি, সে-দিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আন্‌বীট্‌ন সত্যিই। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে কমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু-আধটু নামকরা 'শীল্ড' বা 'কাপে'ই নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে এ-কথা

স্বীকার করা ভালো। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে শুরু করেছে যে, খেলা শেষ হয়ে গেলেও থামেনি। অনেকে হাততালি দিতে-দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভালো খেললেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফঃস্বলের শহর এবং মফঃস্বলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশি হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়েরও একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'-এর কর্মকর্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশী হয়ে জানিয়েছিলেন যে স্টেশন থেকে এক পা গেলেই তাঁদের ক্লাব ও খেলার মাঠ। আমাদের কোন কষ্ট হবে না। স্টেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন। লোক বলতে 'স্টেশনমাস্টার', তা এক পা বলতে 'ঘটোৎকচের পা' যেটুকু তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিতর তিনটে নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গিয়ে যখন নসীপুরে নামলাম, তখন প্রথমে তো মনে হলো গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামতেই আমরা ভুল করে নেমে পড়েছি। এ আবার স্টেশন নাকি? প্ল্যাটফর্ম না থাক, মাটিতে খানিকটা লাল কাঁকরও তো বিছানো থাকে। হুড়মুড় করে আবার ট্রেনে উঠে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় উদয় খুব পর্যবেক্ষণ করে বললে, না রে স্টেশনই বটে, দেখছিস্ না, দু'একটা কাঁকর পড়ে রয়েছে। বাকি সব জলে ধুয়ে গেছে।

কাঁকর দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম। বৃষ্টির ভিতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছ দেখা গেল। গাছ নয়, সেটা স্টেশনের নাম-লেখা সাইন-পোস্ট। বৃষ্টিতে নিচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন-পোস্টের পরে দূরে একটা ঘর এবং তার ভিতর একজন স্টেশনমাস্টার, টিকিট কালেক্টারকেও পাওয়া গেল। তাঁর

হাতে রিটার্ন টিকিটের অর্ধেক দিয়ে রাস্তা জিগ্‌গেস করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হলো। ওটা যে খাল মশাই, যাব কি করে নৌকা না-হলে? স্টেশনমাস্টার বুঝিয়ে দিলেন, খাল নয়, ওটাই রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম, সেই রাস্তায় সাঁতরে ও কাদা ঠেলে ক্রোশ-দুই এগুলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয়। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'টা না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না। কোনমতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করলে। বাড়িতে ফিরবে কিন্তু যাবে কি হেঁটে? সত্যিই তো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাত্তির আটটার আগে কোন ট্রেন এই মাঠে আর থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজী হতে হলো।

নসীপুর কেমন করে পৌঁছালাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার পোলো ও রাগবির মাঝামাঝি কি ধরনের খেলা হলো তার আর বর্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথায় এবার নামা যাক।

এগারো জন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলা-ধূলায় নয়, খেলা-কাদার পর নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শীল্ডের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ'জন কিছুতেই আর থাকতে রাজী হলো না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁতরেই তারা স্টেশনে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটি গোল খেয়ে আমরা একটু বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এরপর বসন্তর আবার একটু জ্বর ভাবও দেখা দিয়েছে। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য নয়? কারণ ধাক্কাটা তার ওপর দিয়েই একটু বেশি গেছে। সে-ই ছিল গোল-কীপার। জ্বর

অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর তো যেতে দেওয়া যায় না। বসন্তর সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও সুরেন রাতটার মতো নসীপুরেই কাটিয়ে দেবো ঠিক করলাম।

ঠিক তো করলাম, কিন্তু থাকব কোথায়? 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'-এর কর্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল'-এর কর্তা স্বয়ং—শুনে একটু অবাক হবেন অনেকের সন্দেহ হয়। আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কি করবে বলা তো যায় না! শীল্ড তৈরির খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন তখন মেমোরিয়ালটা দু'দিন আগে থাকতে হলে কার কি বলবার আছে? যাই হোক, নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু-আধটু ঘোরাফেরা করেও সুবিধেমতো একটি থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসায় স্থানাভাব। পাড়ার বাড়িতে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নিচু বলেই মনে হলো। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে, কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম, 'ব্রজমোহন কাপ' বলে আরও একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল' এর সঙ্গে তাদের আদা আর কাঁচকলার মত মধুর সম্পর্ক। এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সময় উদয়ের বুদ্ধিতে একটি সুরাহা হয়ে গেল। গ্রামের একটি মাত্র চলনসই রাস্তায় বার কয়েক আসা-যাওয়া করতে গিয়ে একটি মাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে। একটু ভগ্নদশা। কিন্তু আমাদের দশা তো তার চেয়েও খারাপ।

উদয় হঠাৎ বলে ফেলে,—এ বাড়িটির খোঁজ তো করেননি মশাই! ওদেরও একটা শীল্ড বা কাপ আছে নাকি!

নগেনবাবু হন-হন করে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—না-না মশাই, ও-বাড়ির দিকে তাকাবেন না।

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বললাম,—কেন মশাই, কিসের দোষটা! একজন বিদেশী লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টি বাদলের রাতে আশ্রয় দেবে না—এমন চামার কেউ আছে নাকি!

নগেনবাবু একটু রেগেই বললেন,—আরে না মশাই! 'গ্রেট বেঙ্গল স্পোটিং ব'ারো গোল খেয়েছিল তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা তো মোটে আট গোল।

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুন এমন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুন্নস্বরে বললে,— একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাও খেতে পারতুম না?

আরে না মশাই, সে-কথা নয়। চলুন চলুন।

কিন্তু আমরা অমন বাড়ির লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিগ্‌গেস করলে দোষ কি, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনবাবু চটে বললেন,—কাকে জিগ্‌গেস করবেন মশাই? ও-বাড়িতে কেউ থাকে?

থাকে না? তাহলে তো আরো ভালো! একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাত তালা ভাঙতেই হয় তো দামটা না-হয় দিয়েই দেবো।

নগেনবাবু আমাদের বিমূঢ় করে বললেন,—তালা নেই মশাই, দরজা সব খোলা।

দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই, তবু এই বৃষ্টির ভেতরে আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন?

ঘুরিয়ে মারছি না আপনাদের, মারবার ইচ্ছে নেই বলেই তো ঘোরাচ্ছি।

উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট করে খোলে। সে-ই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললে—ভুতুড়ে বাড়ি নাকি মশাই ?

নগেনবাবু মুখে কিছু না বলে শুধু একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে বলল,—এতক্ষণ বলতে হয়। ভূত পেলে কি এদেশে মানুষের আশ্রয় খুঁজি ?

নগেনবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন অত্যন্ত,—ও-বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই।

আমি বললাম,—বাড়ির বাইরে থাকা বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই চললাম। শুধু একটা হ্যারিকেন, কটা মাদুর ও একজোড়া তাস যদি জোগাড় করে দিতে পারেন।

নগেনবাবু তারপরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ-বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এ ভুতুড়ে বাড়িতে রাত্তির বেলা জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে আসতেও তিনি নারাজ।

বসন্তকে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে আমরা ভুতুড়ে বাড়ির দেউড়ির নিচে ভবেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঝুপ-ঝাপ করে সমান বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক, একটা জোনাকিরও দেখা নেই। অনেকদিন বিনা-ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুন বাড়িটা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম। গাঁয়ের লোক বাড়িটা দেখে যে ভয় পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বাড়িটা একেবারে গ্রামের একধারে। ধারে-কাছে একটা বসতি নেই। দিনের বেলা বাড়ির যা চেহারা দেখে গেছি, তা একটু অদ্ভুত। দোতলার একদিকে ঘরের জন্যে দেওয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেওয়ালগুলো দরজা-জানালার শূন্য ফোকর নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে

আছে, তাতে বাড়িটার চেহারা সত্যিই কেমন যেন বদলে গেছে। বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম! ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাদে এসে হাজির। সত্যি খুশীই হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিসপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পড়ি-কি-মরি করে দৌড় দিল তা একটা দেখবার জিনিস।

নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার একদিকে গুটি-কয়েক ঘর ঠিক আছে। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে,—কই বাপু ভূত, অতিথি-সজ্জন এল, একটু সাড়া দাও।
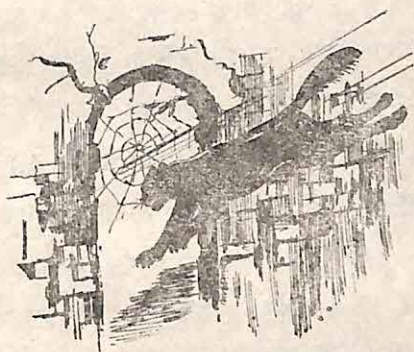
আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে-সঙ্গে আরও কটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা কাঁ্যা—চ করে একটা শব্দ হলো। ভাঙা পুরানো কোন জানালার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়ই, তবু শব্দটা ঠিক জুতসই ও যথাসময়ে বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বললে—বেশ বেশ, এই তো ভদ্রতা। নসীপুর গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূত ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড় ঘড় ঝন-ঝন করে একটা আওয়াজ হলো। একটু চমকে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেললাম। শুধু বসন্ত জ্বরের রুগী বলেই বোধ হয় একটু অপ্রসন্নভাবে বললে,—ঠাট্টা-তামাসা আর ভালো লাগছে না বাপু। বিছানা-টিছানা একটা করতে হয় তো কারো।

স্থরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা কি।

ভবেশ বললে,—সাড়া-টাড়া দিচ্ছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেয় কি না দেখাই যাক না।

পাশের ঘরটা আকারে ছোট। দেয়াল থেকে নোনা-ধরা-চুন-বালি খসে পড়ে ও পুরানো কাঠ-কাটরার ভগ্নাংশ থাকার দরুন অত্যন্ত নোংরা। ঘরে ঢুকেই দু'জনে অমন চমকে উঠব ভাবিনি।

বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে-না-দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতো ফ্যাঁস করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাতিটা নিয়ে এগিয়ে এসে বললে,—শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু ; একটু দর্শনও দেও না! কই তিনি ?

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষুষ। দেখে ভয় পাবারই কথা। অত বড় এবং অমন মিশকালো বেড়াল বাংলা-মুল্লুকে জন্মায় বলে জানা ছিল না। তিনি তাঁর বহুদিনের দখলী-স্বত্বের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জ্বলজ্বলে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে তখন দন্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বললে,—এটা কি ভালো হলো প্রভু? এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়াল রূপ ধারণ করলেন। আপনার নিজমূর্তি কই ?

বেড়ালটা আর একবার ফ্যাঁস করে উঠল উত্তরে, আমরা হেসে

ফেললাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তর বিরক্ত-গলা শোনা গেল, আবার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায়—অন্ধকারেই থাকব নাকি ?

সে ঘরে ফিরলে ভবেশ হেসে বললে,—তোর কি ভয় করছে নাকি ? না, জ্বরের লক্ষণ ?

বসন্ত আরো যেন বিরক্ত হয়ে বললে,—ভয়-টয় জানি না বাপু। আমার ভালো লাগছে না। খুঁজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছ।

আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। খাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাম। কেন বলা যায় না, সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্যে শুতে কেউ ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

তাস খেলা কিছুতেই জমল না। এক সময় সবাই তাস ফেলে দিলাম। সুরেন বললে,—এবার শুয়ে পড়লে হয়। আমরা সবাই সায় দিলাম, কিন্তু কারুর ওঠবার নাম নেই।

হঠাৎ ভবেশ বললে,—সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছ তো! কি রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনেছ ? কে বলবে যে ও-ঘরে একটা কাঠের পা ঠকঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না ?

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলিনি।

ভবেশ আবার বললে,—এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরি করে।

ভবেশের কথা শেষ না হতেই উদয় বললে,—তা না হয় হলো কিন্তু অমন আওয়াজটাই বা কিসের, ও তো আর জানালা নাড়ার শব্দ নয়।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম একবার। সকলেই

একটু যেন হতভম্ব। হঠাৎ সুরেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। কই, কোথাও কিছু নেই তো!

ভবেশ হেসে উঠল,—আমাদেরও ভয় ধরল নাকি? তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না।

উদয় হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—কিন্তু ওটা কি?

আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে। আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম,—একটা কালো রঙের খানিকটা ছেঁড়ে কাপড়।

হেসে বললাম,—রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে নাকি?

এবারে ভবেশই বললে,—কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওই-খানেই দেখেছিলাম না?

তাও তো ঠিক? বেড়ালটাকে তো এইখানেই দেখা গেছল। এই কাপড়কে ভুল করে কি—না, তাও সম্ভব নয়, স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগের ফোঁসফোঁসানি শুনেছি নিজের কানে।

তবু একটু হেসে বললাম,—বেড়ালটা কি তোমার জন্য এতক্ষণ বসে আছে? সে কখন সরে পড়েছে।

কিন্তু কোথা দিয়ে? এ-ঘরের একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া তো দেখতেই পাচ্ছ।

বললাম,—আমাদের ঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়তো। মুখে বললেও মনের খটকা গেল না। আমাদের ঘর দিয়ে কোন বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজান্তে যাওয়া সম্ভব তো নয়। একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম। একটা ধুমসো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না, এমন বেহুঁশ আমরা ছিলাম কি?

ভবেশ বললে,—থাকগে, বেড়ালের অন্তর্ধান-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে—আর—

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ-গলানো জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুৎবেগে।

ওধারের ঘরে বসন্তর সে কি আতঙ্কের চিৎকার। উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি।

ছুটে সবাই ঐ ঘরে এলাম। বসন্ত ছাই-এর মত মুখ করে উঠে বসেছে। তার কপাল-মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে।

হয়েছে কি? কি হলো?

বসন্ত হাঁপাবে না কথা বলবে! অনেক কষ্টে থেমে-থেমে যা বললে তার মর্ম—তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস তার মুখে ফেলেছিল। আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে,—ঘুমের ঘোরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বললে,—না না, আমি জেগে স্পষ্ট সে নিঃশ্বাস শুনেছি, মুখের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ, তারপর চিৎকার করেছি। তোরা ও-রকম করে চলে যাসনি।

ভবেশ হাসবার চেষ্টা করে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি। আমরা এখানেই শুচ্ছি এবার।

উদয় একটু ইতস্ততঃ করে বললে,—এক্ষুনি শুয়ে কি দরকার? জেগে একটু গল্প করা যাক না।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারুর সে কথায় আপত্তি দেখা গেল না, ভবেশেরও না।

বেশ তো। ভবেশ বললে,—কিসের গল্প হবে? বল সুরেন, একটা ভূতের গল্পই বল, এ-বাড়িতে বেশ লাগবে।

বসন্ত তাড়াতাড়ি বললে,—না-না।

যাঃ, তুই একেবারে ভীতুর এক শেষ। বল সুরেন।

সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বললে,—বলবো তাহলে। শোন। 'আনবীট্‌ন ইলেভ্‌ন' বলে এক টিম গেছল নন্দীপুরে—

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বললে,—আহা, বলতেই দাও ওকে।

সুরেন বলতে শুরু করলে,—আমাদের নসীপুরে আসা ও তার পরের ঘটনার যে বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হলে হাসি আসতো নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়া শব্দ বিশেষ নেই। গল্প শেষে ভূতুড়ে বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছল। সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বললে,—ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ আরো নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ। ঘরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় একজন গল্প বলছে, ভূতের গল্প। কেউ সে গল্প বিশ্বাস করে না, গল্প যে বলছে সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে,—অশরীরী কেউ এখানে থাক তো এ তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক।

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

উদয় বললে,—আরে, তাসটা পড়ল কোথায়? সুরেন সত্যি-সত্যিই গল্পের সঙ্গে একটা তাস ছুঁড়েছিল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে,—পড়েছে কোথাও, ওদিকে।

কোথায়? উদয়ের গলায় স্বর তীক্ষ্ণ—ওদিকে তো খালি মেঝে। এ ঘরে জিনিস লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা নেই।

আমি তবু উঠে বসন্তর বিছানার আশেপাশে সমস্ত ভালো করে খুঁজলাম। অন্য সবাইও তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশ্চর্য! আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর। শুধু বসন্তর নয় আমাদের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছে।

ভবেশ হঠাৎ অকারণে অত্যন্ত হেসে উঠে বললে—কি তোমরা যা-তা করছ? পাগল হলে নাকি সবাই? নাও সুরেন, গল্প বলো।

শুকনো পাংশু মুখে আমরা যন্ত্র-চালিতের মতো আবার এসে বসলাম। সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই। সকলের মুখের দিকে চেয়ে

সে আবার একটা তাস তুলে নিলে, তারপর বললে—আগের তাসটা উড়ে গেল—

ভবেশ শুধু বললে,—হুঁ।

আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বললে,—উড়ে যাওয়াটা প্রমাণ নয়। সরেনের স্বর অত্যন্ত অস্ফুট—এবার তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেরিয়ে—

বসন্তর চিৎকার সকলের ওপরে শোনা গেল। তার বিছানার ঠিক পায়ের কাছে—

না, সে-বার অক্ষত দেহেই তার পরের দিন কলকাতায় ফিরছিলাম। শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে। বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।

# জঙ্গল বাড়ির বৌ রানী

অনেক দিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোনো নদীর ওপর পান্‌সি ক'রে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়াল মতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক দিন থেকে—মনে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ—সে আর মন থেকে কোনো কিছুতেই মুছে যায় নি। সে-সব মধুর নামগুলোও ভুলি নি! শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোন জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখনো। সে যেন কোন রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার ছিন্ন পত্রের 'পদ্মায়' তো রেলি ব্রাদার্সের পাটের স্টিমার যায় না, সে পদ্মা সাত সমদ্দুর তেরোনদীর একটি-রুপো-গলানো, তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড়জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলায় সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারিনি, কারণ নদীটা পদ্মা নয় —ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হোল, ফুলে উঠলেই হলো হাওয়ার দূরের নৌকোর পাল, আজ রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হলো তাদের ছায়া।

বরং আসল পদ্মার ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হতো। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগতো কাটাকাটি—মারামারি, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমতো না মধুর করে। আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের। সেও ছোট খাট রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙ্গন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চখা-চখির ডাকে তার দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে।

মাঝারি সাইজের একটি পান্‌সি ভাড়া করে নিলাম। মাঝি-মাল্লা, চাকর-বাকর নিয়ে সবশুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরে সুস্থে যেমন খুশি, ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, বড় বড়গঞ্জে কি লোকালয়ে ভীড় করা ঘাটে নয়, শূন্য-নির্জন তীরে তীরে। শুধু পাখির ঝাঁক-বসা চার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবারই ছুটি, একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহনায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হলো তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রে'র স্বপ্নের কুয়াসা মনের মধ্যে না থাকলে পান্‌সির জীবন বেশ পান্‌সে হয়ে উঠতে পারতো? গরমিল তো কম নয়। 'ছিন্ন পত্রে'র পদ্মায় কচুরি পানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া রামসেবকের কান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত

খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে এই জন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝরাত্রে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পান্‌সির কোলে, আর মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম থম করছে, তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ আছে নিস্পন্দ ভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা।

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে এ আমি আগে কখনো জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন অপার্থিব বিবর্ণতা। যেন অনেক দিন মাটির তলায় সে চাপা পড়ে ছিল। এই সবে মাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলাধরা ভিজে-মাটি মুছে গা থেকে!

লোকটার ধরন ধারণাও অদ্ভুত! কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারি হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু 'হাঁ না' ছাড়া আর কিছু বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলা-মেশাও নেই তবুও সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ ক'রে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্য।

সেদিনও মেঘে-ঢাকা ভাঙা-চাঁদের মরা-জ্যোৎস্নায় চারদিক ছমছম করছে।

সন্ধে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিস ফিস শুনলাম। রাত একটু হলেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে, কান মাথা চুলকে, আমতা

আমতা করে জানালে যে, আমি যদি তাদের ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো যাত্রা শুনে আসে।

'যাত্রা' কোথায় হচ্ছে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেইখানেই নাকি ভারি নাম-জাদা একদল এসেছে। এমন যাত্রা শোনবার ভাগ্য নাকি এ-তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে সে আমাকেও যাওয়ার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম না মাঝির পো, আমার অত শখ নেই, তবে তোমরা শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন, কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে আমায় সে কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোরবেলায়, কিন্তু তোমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে মন্দ কি!

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই। জলঝড়ের সময় নয় নৌকো নোঙর বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানি না, চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?

মাঝির মুখে 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে কেমন যেন আশ্চর্য বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পান্‌সির কামরার ছাদে উঠে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনো তো হয় নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রাম-সেবকও পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা ছুটো নৌকার আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ কথা ভাবতেও কেমন যেন পুলকের রোমাঞ্চ হয়।

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না।

রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান করতে করতে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গেছে, ভাঙা চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কুলহান ধলেশ্বরীর রুগ্ন মিলন চেহারাটা ভারি অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-জানা পাখি দূর-আকাশে কিরকম আর্তনাদের মতো ডাক-ছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমানো উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড় একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটলধরা বিশাল দেওয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম এতক্ষণে জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো-প্রাসাদ কুয়াশায় মিশেছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো-প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হলো।

পেছনে কি একটা ঝন্‌ঝন্‌ করে শব্দ হলো যেন। সত্যি বলছি এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটি লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

একি চরণ! প্রায় ধরা গলায় বললাম তুমি কখন ফিরলে? যাত্রা দেখলে না?

সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পানসির ওপর রেখে গভীর স্বরে বললে, না!

কিন্তু নোঙর তুললে কেন?—অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছেন!

দেখিনি, কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রি শেষে যে অদ্ভুত অসাধারণ সবঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছে আমার জীবনে, তখন তা তেমন ভালো ক'রে বোধহয় বুঝি নি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুল ভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে ও? জানো নাকি! প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম বিস্ময়-উত্তেজনায়। হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়াতে না ভিড়াতে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত—ব্যাকুলস্বরে বললেন—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান। দোহাই আপনার।

সে-অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করব, কিন্তু কি ব্যাপার, আমার একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারি জিনিস তিনি বয়ে এনে ছিলেন। কামরায় চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে ভদ্রতা ক'রে বললাম—ওটা বড্ড ভারি বোধহয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি এ কথায় এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে

নিশ্চয়ই ও কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ়ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল ক'রে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধহয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত আকারের বাক্স বের ক'রে আমার সামনে রেখে তিনি বললেন—আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনি হয়ে গেছি।

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো ক'রে দেখলাম। চেহারায় তার স্পষ্ট বড় ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা ধরন-ধারণ যেমন তার অদ্ভুত, তেমনি তাঁর পোশাক! যাই হোক, তখন সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় তাঁর। কি আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ভেতর, কুণ্ডলী পাকান একরাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হীরা মুক্তোর জড়োয়া গয়না। তেমন গয়না আমি তো কখনো দেখি নি।

মহিলাটি মুঠো ক'রে কয়েকটা গয়না বাক্স থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড়বস্তু নয়, ক্রূর সরীসৃপ।

দরজায় খুট ক'রে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি চরণ, কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক।

পলক ফেলতে না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু

বিরক্তির স্বরে বললাম—তুলে ফেলুন এসব বাক্সে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কি বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন।

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাক্সে তুলতে তুলতে তিনি বললেন—বেরুব না? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিয়ে চায়।

ওরা কারা!

আমার শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতেও পারে। কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিন রাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু'ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি, আমায় সেখানে পৌঁছে দিন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি—বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য। চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকা চলেছে।

বললাম-ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকা থামিয়ে খবর নিও।

নিশ্চল ভাবে বসে কি যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে! অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরায় ঢুকে বসলাম—আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতর দরজা দিয়ে দিন।

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন—না না, সে আরো ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। একি নৌকা হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি! পান্‌সি নিজের খেয়ালে ঘুরছে।

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে

যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কি হিংস্র লোভ তার, অমানুষিক চোখ ও মুখ। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে।

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চীৎকার ক'রে বাক্স সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা। আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটা মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কিরকম একটা আচ্ছন্ন—অভিভূত অবস্থা। চোখের সামনে যা ঘটেছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে-দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কি ক'রে!

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা ক'রে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকার ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংহত ক'রে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্স-শুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চিৎকার ক'রে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারি সেই বাক্সের টানে দু'জনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে, কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তার সাহায্যের আশায়!

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক নিশ্বাসে

তাদের যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দু'জনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে হেসে উঠল। হেসে জানাল যে এ-রকম আজগুবি ব্যাপার হ'তেই পারে না যত ভারি জিনিসই হোক একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাতেধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দু'জন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতোই। আর তা ছাড়া দু'ক্রোশ কেন এদিক-ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোন পোড়ো বাড়িই নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাক্স সমেত ওরকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এক কোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তার কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্তস্বরে বললে—না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেন নি, আমি জানি আপনি জঙ্গল-বাড়ির বৌরাণীকে দেখেছেন।

তার সমর্থন একটু ভরসা পেয়ে বললাম—জঙ্গল-বাড়ির বৌরাণী তুমি জান তাহলে। কোথায় জঙ্গল-বাড়ি বলো তো?

খানিক চুপ ক'রে থেকে নিচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে—ওইখানে বাবু। আজ পঞ্চাশ বছর হ'লো জঙ্গল-বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌরাণী তাঁর জ্বালা ভোলেন নি। এখনো মাঝে মাঝে কারো পানসিতে এসে ওঠেন।

জেলেরাই আমার পান্‌সি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝি-মল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাকি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম, সব না হয় স্বপ্ন। কিন্তু আমার পান্‌সির নোঙর কে তুললে?

পান্‌সির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পান্‌সি বিহারে। আমি ছিন্নপত্র'ই পড়ব।
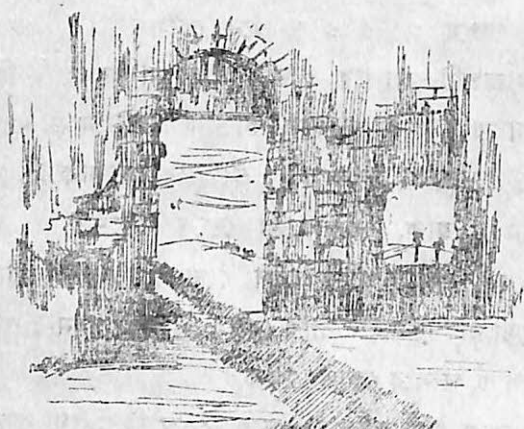
ছেলেবেলা হইতে ভ্রমন করা আমার নেশা। এই পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থির হইয়া কোথাও তিনমাস বসিতে পারিয়াছি এমন কথা স্মরণ করিতে পারি না।

একলা একলাই ঘুরিয়াছি, যে সব বাঁধা পথে সাধারণ লোক চোখ-কান বুজিয়া বারকয়েক যাতায়াত করিয়া জাঁকাইয়া গল্প করিবার মত ভ্রমণ সাঙ্গ হইয়াছে মনে করে সে পথে যাইতে আমার ভালো লাগে না।—অদ্ভুত সব জায়গা, অজানা সব রেল-লাইন. নগণ্য সমস্ত স্টেশন খুঁজিয়া বাহির করিতেই আমার আনন্দ। এই বিদেশে-যাত্রায় আমার কোনদিন কোন সঙ্গী মিলিবে আশা করি নাই, কিন্তু তাহাই একদিন মিলিয়াছিল আশ্চর্য রকমে। সেই গল্পই আজ বলিতেছি।

সুদূর রাজপুতানার জে, বি রেলওয়ের মারতা রোড স্টেশনে বসিয়াছিলাম। ফুলেরা জংশন পর্যন্ত যাইবার ইচ্ছা অবশ্য ছিল না, মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, তাহার আগেই দেগানা স্টেশনে অবতরণ করিব।

মরুভূমির মাঝে স্টেশনটি অত্যন্ত ছোট। ওয়েটিংরুম নাই, একটা ছোট ঘর আছে, কিন্তু তাহাকে ওয়েটিংরুমের সম্মান দেওয়া চলে না। ঘরের মেঝেতে বালি ছাড়া আর কিছু নাই। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, এখন তাহার পায়া খসিয়া যাওয়ায় তাহার বসিবার জায়গাটা মেঝেতে পড়িয়া আছে মাত্র।

একেবারে বালির উপর না শুইয়া সেই তক্তার উপরই কম্বল পাতিয়া শুইয়াছিলাম। মরুদেশর এই সময়টায় দিনের বেলায় যেমন অসহ্য উত্তাপ, রাত্রে তেমনি কন্‌কনে শীত। একটু অগুন দিলে ভাল হয় মনে হইতেছিল। ষ্টেশনে জনপ্রাণী নাই। যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি ষ্টেশন মাষ্টারী করেন, তাহার কোয়ার্টার নিকটেই। ষ্টেশনের একটিমাত্র চাকরের সঙ্গে তিনি সেখানে তখন বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। ট্রেন আসিবার মিনিট পনোরো আগে আসিলেই তাহার চলে।

পরিষ্কার জ্যোৎস্নার রাত্রি। যে ঘরে বসিয়াছিলাম, তাহার জানালার বালাই নাই। একটা দরজা আছে, কিন্তু তাহাও একেবারে খোলা বন্ধ করিবার মত কোন পাল্লা সেখানে কোনদিন বসান হয় নাই। সেই দরজা দিয়া চন্দ্রালোকে বহুদূর পর্যন্ত মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, জ্যোৎস্নায় সমস্ত বালির সমুদ্র মনে হইতেছিল। কে যেন রুপার গুঁড়া ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

শুইয়া শুইয়া বিশাল মরু-প্রকৃতির রহস্যময় নিস্তব্ধতা সত্যই উপভোগ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, পৃথিবীর মমতাময়ী মাতৃরূপও যেমন সত্য, এই কাঠের তপনীরূপও তেমনি। স্নিগ্ধ শস্য-শ্যামলা মাটির স্নেহময়ী রূপ দেখিলে মনে হয়, মানুষই বুঝি সৃষ্টির

সবচেয়ে বড় কথা। তাহাকে লালন করিবার জন্যই পৃথিবীর যেন যত ব্যাকুলতা। কিন্তু এই দিক-চক্রহীন মরুপ্রান্তরে মানুষ নগণ্য হইয়া গিয়াছে—মানুষের প্রতি এই উদাসীন প্রকৃতির ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নাই। এই বিশাল প্রান্তরের মাঝে ক্ষীণ একটি রেখা অনুসরণ করিয়া খেলনার রকেটের মত অসহায় ভাবে মানুষের সৃষ্ট দুর্ধর্ষ ইঞ্জিন গাড়িসমেত যাতায়াত করে। আকাশ, ধরণীর অসীমতার মাঝখানে মানুষের জীবনের মতই তাহাকে কিঞ্চিৎকর মনে হয়।

এমনি সব কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের প্ল্যাটফর্মে কাহার যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। ট্রেনের ত' এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। ইহার মধ্যে স্টেশন-মাষ্টারের ত' আসিবার কথা নয়। সেই মুহূর্তেই দরজায় কাহার দীর্ঘ ছায়া পড়িল। শুধু ছায়া দেখিয়া মানুষের চেহারা অনুমান করা যায় না, তবু মনে হইল লোকটা অত্যন্ত দীর্ঘকায়, তাহার পিঠে একটা বস্তার মতও কিছু আছে বলিয়া মনে হইল।

ছায়া আর কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইল না। পদশব্দে বুঝিলাম, লোকটি আবার অন্যদিকে ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। খানিক বাদে আবার পদশব্দ আমার ঘরের দিকে আসিতেছে শুনিতে পাইলাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবারও লোকটির ছায়া আমার দরজায় পড়িবার পরই সে ফিরিল। ছায়ার বেশী আর কিছু দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল না।

তাহার পর আধঘণ্টা ধরিয়া এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সত্যই আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। এই কন্‌কনে শীতের রাত্রে একেবারে পা গুনিয়া গুনিয়া কে প্ল্যাটফর্মে এমন করিয়া পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। উঠিয়া দেখিতে অবশ্য পারিতাম, শুধু গরম কম্বলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উঠিবার উৎসাহ তখন ছিল না।

শেষ পর্যন্ত যখন উঠিলাম, তখন স্টেশনের চাপরাশী ট্রেন আসিবার

ঘণ্টা দিয়াছে এবং স্টেশন-মাষ্টার তাঁহার অফিস ঘরে বসিয়া লাইন ক্লিয়ারের তারই বোধহয় গ্রহণ ও প্রেরণ করিতেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য। সমস্ত প্ল্যাটফর্মে আমি একা ছাড়া আর কোন যাত্রী নাই। এতক্ষণ ধরিয়া যে লোকটির ছায়া দেখিলাম, যাহার পদচারণার শব্দ শুনিলাম, সে গেল কোথায়!

রহস্যের মীমাংসা করিবার পূর্বেই ট্রেন আসিয়া পড়িল, ফাঁকা একটা গাড়ী দেখিয়া রাত্রে ঘুমাইতে পাওয়ার আশায় চড়িয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ফাঁকা গাড়ীতে সমস্ত শার্সি তুলিয়া দিয়া নীচের একটা বেঞ্চিতে কম্বল 'বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় খুক্ করিয়া কাশির শব্দে অবাক হইয়া উপরে তাকাইলাম। যতদূর মনে পড়ে এই কামরায় ঢুকিবার সময় চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আমার দেখার কি এমনই ভুল হইয়াছিল!

আমার বিপরীত দিকের বাঙ্কের উপর একটি লোক বসিয়া আমারই দিকে অদ্ভুতভাবে চাহিয়া আছেন। লোকটির চেহারা অসাধারণ। বয়স প্রায় প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এই রাজপুতের দেশেও এমন বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা খুব কম চোখে পড়িয়াছে। তবে সাধারণ রাজপুত অপেক্ষা রঙ্ লোকটির ময়লা।

আমাকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া লোকটি চমৎকার হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতদূর যাবেন?"

আমি গন্তব্য স্থান বলামাত্র হঠাৎ তিনি বাঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া নীচের বেঞ্চিতে বসিয়া বললেন—"আপনি বাঙালী, কেমন না?"

নিজের পোষাক ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার একটু গর্ব ছিল। আমার এই পোষাকে এই সুদূর দেশে বাঙালী বলিয়া চিনিতে পারিবে, আশা করি নাই। বলিলাম কেমন করে বুঝলেন?

তিনি একবার পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিলেন—"নিজেও বাঙ্গালী বলে।"

ট্রেনের দুইধারে বেঞ্চি হইতে এইবার আমাদের আলাপ সুরু হইয়া গেল। এই শুষ্ক মরুর দেশে আমারই মত আর একজন ভবঘুরে বাঙালীর সাক্ষাত পাইয়া নিদ্রার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ আলাপের পর মনে লোকটির প্রতি একটু শ্রদ্ধাই হইল। যাযাবর বৃত্তি অনেক কাল হইতে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু শুধু বয়সে নয়, অনেক দিক দিয়াই এই লোকটির কাছে আমি শিশু, তাঁহার চুলে পাক ধরিলেও পর্যটনের নেশা আমার চেয়ে এখনও প্রবল আছে দেখিলাম।

কত অদ্ভুত জায়গাই না তিনি দেখিয়াছেন, কত অদ্ভুত ঘটনাই না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।
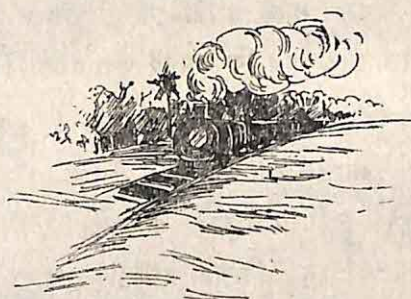
গল্প করিতে করিতে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই। এই বন্ধ্যা বালির দেশে স্টেশনগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাইতে অনেকক্ষণ লাগে কিন্তু তবু মনে হইল যে এতক্ষণ দেগানার আগের স্টেশনের কাছে পৌঁছবার কথা।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়াইয়া কিন্তু স্টেশনের কোনকিছু দেখিতে পাইলাম না! চাঁদ পশ্চিম দিকে হেলিয়া প্রায় ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু বালির সমুদ্রে ট্রেনের কামরাগুলির আলো ছাড়া স্টেশনের কোন আভাস কোথাও নাই।

জানালা হইতে মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, আমার সঙ্গী মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিলেন—"পৌঁছবার এত তাড়াতাড়ি কেন? এমন ক'রে যাওয়াতেই ত সুখ।"

বলিলাম—"আমাদের সুখ হতে পারে, কিন্তু ট্রেন ত যথাসময় যথাস্থানে পৌঁছোবে!

এবার তাঁহার উত্তরের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি বলিলেন,—"তারই বা কি মানে আছে?

ভদ্রলোকের কথাবার্তা ক্রমশঃই অদ্ভুত মনে হইতেছিল। এ কথার উত্তরে কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় ট্রেনেও তীব্র হুইসিলের শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। রাত্রে চলন্ত ট্রেনের তীব্র হুইসিলের শব্দ সাধারণ অবস্থাতে ও কি অদ্ভুত শোনায়, তাহা অনেকেরই জানা আছে। গাড়ীর চাকার অশান্ত আওয়াজের ওপরে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ স্বর প্রবল গভীর অনুভূতিতে তীব্রতর করিয়া তুলিয়া একটা আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদের ইঙ্গিত যেন বহন করিয়া আনে।

সেদিন কিন্তু বিশাল মরু-প্রান্তরের মাঝে ইঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ ঠিক আর্তনাদের মত শুনাইতেছিল।

শব্দ আর থামে না! ট্রেনের গতিমুখ পরিবর্তনের সঙ্গে কখনও একটু ক্ষীণ, কখনও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া সে শব্দ অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে।

এখানে একটিমাত্র লাইনে একটি করিয়া গাড়ী যায় বলিয়া লাইন ক্লিয়ারের গোলযোগ কখনও হয় না। তাহা হইলে এই অশ্রান্ত হুইসিলের কি প্রয়োজন? জানালার শার্সিটা আবার তুলিয়া ফেলিলাম। বাহিরের কনকনে হাওয়ার সঙ্গে ইঞ্জিনের চীৎকার যেন তীব্রতর হইয়া সত্যকার তীক্ষ্ণ ছুরিকার ফলার মতই আমাকে বিদ্ধ করিল। পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে চাঁদের অর্ধেক সমাধি তখন হইয়া গিয়াছে। স্তিমিত আলোকে অসীম বালির সমুদ্র মনে হইল যেন মূর্ছাগত হইয়া আছে আর তাহারই ভিতর প্রকাণ্ড একটা

বেগবান্ সরীসৃপের মত কোন অবর্ণনীয় আতঙ্কে উন্মত্তের মত আর্তনাদ করিতে করিতে আমাদের ট্রেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে মনে হইল। অনুভব করিলাম ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। ট্রেনের আর্তনাদ যেন আমারই বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

ঘরের মধ্যে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, ভদ্রলোক তাঁহার পিঠে একটি থলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারও মুখ ভার পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। আমার দিকে চাহিয়া ভীত অর্ধস্ফুট স্বরে তিনি বলিলেন—"আর সময় নাই।

কিসের যে বিপদ, ভালো করিয়া বুঝিবার তখন আমারও সময় নাই। আমার মনের ভিতরও সমস্ত যেন ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ বিরাম-হীন চীৎকারে বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। শুধু গাড়ীর চাকার একঘেয়ে শব্দ অনুভব করিতেছিলাম যেন প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়াবহ সম্ভবনার দিকে নিরুপায়ভাবে আগাইয়া চলিয়াছি।

জীবনে বিপদে কখনও পড়ি নাই এমন নয় কিন্তু এমন আতঙ্ক অতি বড় দুঃস্বপ্নের মাঝেও কখনও অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার অন্তরের গভীরতম তলদেশ হইতে উঠিয়া বিপুল বন্যার মত এই ভয়ের অনুভূতি আমার চেতনাকে যেন গাঢ়ভাবে ঘিরিয়া আসিতেছে—এ মুহূর্তে চেষ্টা না করিলে তাহার কবল হইতে আর অব্যাহতি মিলিবে না।

আমার সঙ্গীর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। একহাতে কামরার দরজাটা খুলিয়া ধরিয়া তিনি অঙ্গুলির সঙ্কেতে আমায় ডাকিয়া বলিল—"আসুন।"

তাঁহার সে-ডাক যেন আমার পক্ষে অলঙ্ঘনীয় আদেশ মনে হইল আমাকে যাইতেই হইবে। আমার সমস্ত দেহ-মন যেন তাঁহার সেই ডাক অনুসরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। আসন্ন বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইবার সেই একমাত্র উপায়। ট্রেন হইতে আমার এই মুহূর্তেই লাফাইয়া পড়িতে হইবে।

জানালা দিয়া আর একবার বাহিরে চাহিলাম। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ তখন ডুবিয়া গিয়াছে আকাশ ও ধরণী গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। তাহারই ভিতর ইঞ্জিনের চুল্লির লাল আলো রাক্তাক্ত ক্ষতের মত দেখাইতেছিল। সেই ক্ষতের জ্বালায় অস্থির হইয়া যেন এই বিরাট প্রাণীটি ছট্ফট্ করিয়া আতঙ্কে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিত্যকার স্টেশন লাইন সমস্ত যেন আমরা আজ ফেলিয়া আসিয়াছি। অসীম মরুর মাঝে আমাদের ট্রেন যেন দিক্ ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। আর সেই আর্তনাদ—সত্যকার রক্তমাংসের জীবের কাছ হইতেই যেন তাহা বাহির হইয়া আসিতেছে—সমস্ত সেই অস্বাভাবিক চীৎকার প্রতি মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এ ট্রেন আর খানিক বাদেই ধ্বংস হইয়া যাইবে, মনের মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গীর সহিত লাফাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার সঙ্গী দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া পড়িলেন। আমি দরজার কাছে অগ্রসর হইলাম।

কিন্তু আতঙ্কের বন্যা চেতনাকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে বোধহয় পারে নাই; কোথায় একটু শিকড় আশ্রয় করিয়া তখনও আমার চেতনা বোধহয় জাগিয়াছিল। সমস্ত দেহ-মন অত্যন্ত প্রবল একটি আকর্ষন অনুভব করিলেও গাড়ি হইতে লাফাইতে পারিলাম না, দরজার হাতলে হাতটা যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করিয়া আটকাইয়া রহিল।

হঠাৎ চমকিত হইয়া অনুভব করিলাম ট্রেনের হুইসিলের শব্দ থামিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে সামনের দিকে চাহিয়া একটি স্টেশনের আলো যেন দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হইল।

দরজাটা বন্ধ করিয়া বেঞ্চিতে আসিয়া বসিলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছিল এই দারুণ অস্বস্তির ভিতর সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছিল। সহসা আমার সঙ্গীর কথা মনে করিয়া সচকিতে উঠিয়া

দাঁড়াইয়া শিকল টানিতে গেলাম—কিন্তু পারিলাম না। মাথাটা সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত ঘুরিয়া উঠিল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞান যখন হইল তখন দেগানা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। একটি বৃদ্ধ রাজপুত আমার গাড়িতে। তাহার দরজা খোলার শব্দেই চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, এবং বাহিরে স্টেশনের নাম দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।

দেগানা স্টেশনটি আরও ছোট। রাত্রির শেষ প্রহরে গাঢ় অন্ধকারের মাঝে একটি বাতি—তাহা স্টেশন-মাষ্টারের ঘরের সামনের প্ল্যাটফর্মটুকুকেই আলোকিত করিয়াছে মাত্র। রাস্তার ঘটনা জানাইবার জন্য তাড়াতাড়ি স্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকেই গেলাম।

স্টেশন-মাষ্টারের অফিসে দেখিলাম স্টেশন-মাষ্টার গাড়ির ড্রাইভারকে ধমক দিতেছেন। গাড়ি নাকি দুই ঘণ্টা লেট হইয়াছে। এখন বিপরীত মুখী গাড়ির জন্য তাঁহাকে সাইডিং এ ফেলিতেই হইবে, এবং তাহাতে দেরী হইবে আরও বেশী।

রোজ রোজ এই রকম লেট হইতেছে এই অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া ড্রাইভার জানাইল—সে কি করিবে, আজও বাঙ্গালীবাবু নিশ্চয় তাহার গাড়ি চাপিয়া-ছিল! কথাটার মর্ম কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। স্টেশন-মাষ্টার ক্রুদ্ধ হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল; আমি আর দেরী করিতে না পারিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ট্রেনের ঘটনা বলিলাম—"এখনও কুলি পাঠাইলে তাঁকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।" নিজে আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে রাজি আছি একথাও জানাইলাম। কিন্তু আমার কথার পর তাদের ব্যবহারে আমি গর্বভরে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য কিনা?

স্টেশন-মাষ্টারেরও রাগ দেখিলাম দূর হইয়া গিয়াছে। আমার কথায় তাহাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"একটা

লোক হয়ত মারাই পড়েছে, আর আপনারা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন না ?"

স্টেশন-মাষ্টার একটু হাসিয়া বলিলেন—"সে চেষ্টা দশ বছর আগে করা উচিত ছিল বাবু, এখন আর হয় না।"

"তার মানে ?

"তার মানে, দশ বৎসর আগে এ রেলের একটা ব্রাঞ্চ লাইনে ট্রেন আউটলাইন হয়ে যাওয়ার থেকে লাফাতে গিয়ে একজন বাঙ্গালী বাবু মারা পড়েছিলেন। সে ব্রাঞ্চ লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু লোকে বলে বাঙ্গালী বাবু এখনও সেই লাইনে নাকি ট্রেনকে এক একদিন চালিয়ে নিয়ে যান। এক একদিন সে কারণে এ লাইনের গাড়ি লেট্ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্বেই চমকাইয়া উঠিয়া আমি তাঁহাকে চুপ করিতে বলিলাম। নীরব হইয়া সকলেই আমার ভীত দৃষ্টি অনুসরণ করিল। প্ল্যাট-ফর্মের একটিমাত্র বাতির আলোয় একটি দীর্ঘকায় পুরুষের ছায়া আমাদের ঘরের দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে—দেখিলেই মনে হয় পিঠে তাহার একটা কিছু ভার আছে। ভালো করিয়া দেখিতে দেখিতেই ছায়া সরিয়া গেল।

এখানেও মহাকালের পথের পথিক বুঝি তাহার নিঃসঙ্গ যাত্রার সঙ্গী খুঁজিতে আসিয়াছিল।
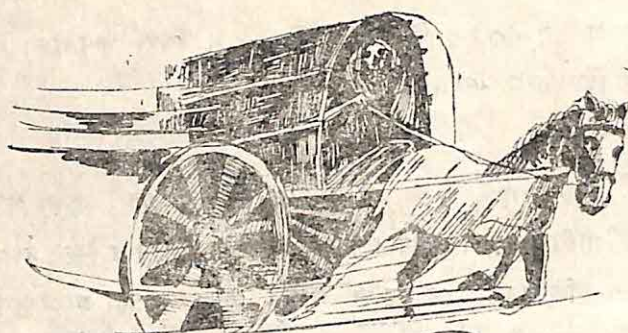
# সাল তারিখ নেই

হ্যাঁ গোটা মুল্লুকের মাথাতেই চন্দ্রবিন্দু! কিন্তু সে বৃত্তান্ত বলার আগে মেজ কর্তার কথা একটু বলে নিতে হবে। মেজকর্তা মানে সেই মেজকর্তা যার ছেঁড়া-খোঁড়া, হলদে-হয়ে-আসা পাতার খেরো খাতাটা লাল শালুর একটা ফালিতে পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় কলকাতায় দক্ষিণ থেকে উত্তরের সব চেয়ে লম্বা পাড়ির বাসের একটা বেঞ্চিতে ভি আই পি রোড ছাড়িয়ে এয়ার পোর্টে যাবার রাস্তায় বেওয়ারিশ হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল।

যারা বেঞ্চির ওপর পুঁটলিটা পড়ে থাকতে দেখেছিল, আমি তাদের একজন।

বাসে তখনও যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ যখন পুঁটলিটা নিজের বলে দাবী করেন নি, তখন বাইরের চেহারা দেখে আর ভেতরটা টিপে টিপে বের করার চেষ্টা করে পুঁটলিটা খুলে ফেলতে দোষ নেই বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।

পাঁচজনের সাক্ষাতে খুলে তার মধ্যে ওর বেরঙা তেলচিটে ছেঁড়া খোঁড়া এলোমেলো আলগা পাতার খেরো খাতাটা দেখবার পর পুঁটলিটা সম্বন্ধে কেউ উৎসাহ বোধ করেন নি। আর আমি একটু নেড়েচেড়ে দেখে নাম ঠিকানা কিছু পেলে সেখানে পাঠিয়ে দেব বলে কথা দিয়ে খাতাটা তখনকার মত বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে আপত্তি হয় নি কারুর।

খেরো খাতাটা বাড়িতে নিয়ে এসে আমি যে ঘাঁটাঘাঁটি করার দায় নিয়েছিলাম সেটা নেহাত নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রেরণায় কিন্তু নয়। বাসের মধ্যেই খাতাটা পুঁটলি থেকে বার করার সময় তার ছেঁড়া সব আলগা পাতার একটা ছুটো কথা আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল আর সেকেলে হাতের ধাঁচে লেখা সে কথা ক'টাই মনটাতে একটু রহস্যের সুড়সুড়ি দিয়েছিল লাগিয়ে।

পুঁটলি বাঁধা খেরো খাতাটা বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে যাবার আগ্রহটা তাই ছিল অত বেশি।

বাড়িতে এসে খাতাটা ঘাঁটাঘাঁটি করবার পর বাস এর মধ্যে প্রথম পাওয়া সুড়সুড়িটা নেহাত মিথ্যে ছিল না বলেই অবশ্য প্রমাণ পেয়েছি। কষ্ট করে এ বেয়াড়া পুঁটলিটা বাড়ি বয়ে আনা পণ্ডশ্রম হয় নি।

তবে যতদূর পর্যন্ত খাতাটার মর্মোদ্ধার করেছি তার মধ্যে এ খাতার মালিকের কোনো নাম ঠিকানার হদিস মেলে নি।

পাবার মধ্যে পেয়েছি মেজকর্তা বলে একটা নাম আর তাঁর বাতিকের বৃত্তান্ত। কিন্তু তিনি কবেকার কোথাকার কি জাতকুল শীলের মানুষ তার কিছুমাত্র আভাসও মেলে নি।

তা না মিলুক, তাঁর বাতিকের বৃত্তান্তই ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। বাস-এ খেরো খাতার পুঁটলি খোলবার সময় ছু-

একটা কথা যা হঠাৎ চোখে পড়েছিল সেগুলোর রহস্যের সুড়সুড়িতে ফাঁকি ছিল না সত্যিই, আশা যা জেগেছিল তা মিটেছে।

কথা কটা কি জাতের যে ছিল তা এতক্ষণে কারুর ধরে ফেলতে আর বোধহয় বাকি নেই।

হ্যাঁ, তার একটা কথা হল 'গায়ে কাঁটা' আর একটা 'অশরীরী' আর বাকিটা একেবারে সোজাসুজি 'ভূত শিকার'।

মেজকর্তার খেরো খাতা আগাগোড়া শুধু ভুতুড়ে গল্পে ভরা। সে সব ভূতুড়ে গল্পও একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

প্রথমে একটা-দুটো গল্প পড়ে বিবেকের দংশনে পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়েও দিয়েছি। ঠিকানা যাঁর মেলেনি তিনি যাতে কাগজে ছাপানো গল্প পড়ে নিজের বলে চিনতে পেরে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে খাতাটা দাবি করতে আসতে পারেন।

তিনি আসবেন এটা কিন্তু আশা নয়, ভয়। প্রথম গল্প ছাপা হবার পর থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি, কখন হঠাৎ নিচে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে, আর জানালা থেকে 'কে?' বলে সাড়া দিতে অচেনা গলায় শুনতে পাই আমি মেজকর্তা, আমার খেরো খাতাটা নিতে এসেছি।

না, এখনও পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি। সুতরাং ভয়ের ধুকধুকুনি নিয়েই আর একটা গল্প শোনাতে পারি।

এটাও মেজকর্তার ভূত শিকারের বৃত্তান্ত। মেজকর্তার নিজের জবানীতেই তাই শোনাচ্ছি।

বটকেষ্টর ওপর তখন রাগ যা হচ্ছিল তাকে সামনে পেলে আর আস্ত রাখতাম না।

হতভাগা শেষ পর্যন্ত এমনি করে আমায় মিথ্যে হয়রানি করাবে তা ভাবতে পারি না।

হয়রানি অবশ্য আমি গ্রাহ্য করি না যদি তাতে যা চাইছি আখেরে তা মেলে। কিন্তু এ ত দেখছি একেবারে কাটা কানের পেছনে ছুটে

মরা। যার পেছনে ছুটছি সেটা সত্যিই কাটা কান কিনা তারই ঠিক নেই।

কোনও রকমে বেনাপোলের হাটে গিয়ে পৌঁছে গেঁয়োখালির রাস্তাটা ধরে এগোলেই হল। গোটা অঞ্চলটারই মাথায় যেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া। সব সেই 'তেনা'দের রাজত্ব। সন্ধ্যের পর মানুষজন ত ছার, কুকুর বেড়ালও নাকি হাটে মাঠে থাকে না। তেমন দায়ে পড়ে বার হতে হলে রঘুপতি রাঘবের নামটা মনে মনে জপতে হয় আর দৈবাৎ আর কোনো জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গলার আওয়াজটা লক্ষ্য করতে হয়। রাত-বিরেতে ও অঞ্চলে নাকি খোনা আওয়াজ ছাড়া কিছু শোনাই যায় না।

বটকেষ্টর এ সব রং চড়ানো ব্যাখ্যানে অবশ্য আমার হাসিই পেয়েছে। আহাম্মকটা কোথায় কেমন করে রং চড়াতে হয় তাও জানে না। তা ওসব বর্ণনা শুনে আমি এত দূর আসিনি।

তার একটা কথাই শুধু আমার মাথার মধ্যে ঝনাৎ করে গিয়ে বেজেছে। সে লিখেছে, 'গোটা অঞ্চলটার মাথাতেই যেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া।' এ রকম কথা ত আমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করা শ্রীমান বটকেষ্ট শর্মার মাথায় আসবে না। এ কথাটা ওখানেই সে কারুর মুখে শুনেছে নিশ্চয়। আর এমন একটা কথা যাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তিনি শুধু কোনো মৌতাতের খুশির খেয়ালে শূন্য হাওয়ার ওপর এমন একটা লাগসই বর্ণনা বানিয়ে তুলতে পারেন না। তা সম্ভব নয়। একটুখানি সার এমন বর্ণনার তলায় কোথাও অবশ্যই আছে।

গোটা অঞ্চলটার মাথাতেই যেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া।

বেনাপোলে পৌঁছোবার কোনো ঝামেলাতেই গা করি নি ওই বুকনিটি যাঁর তার সঙ্গে দেখা করবার আশায়। হাটতলায় পৌঁছে ওরকম কথা বলতে পারে এমন মানুষের খোঁজ করেছি প্রথম।

কিন্তু কোথায় কাকে পাব—সব ত ভোঁ ভোঁ বললেই হয়। হাট-

বার অবশ্য দুদিন আগেই পার হয়ে গেছে। ভাঙা হাট দু-চারজন ফড়ে শুধু ঝড়তিপড়তি কিছু সওদা এখন ছড়িয়ে বসে আছে, নইলে হাট একেবারে ফাঁকা। হোগলার চালগুলোও গুটিয়ে তুলে নিয়ে যাবার পর দোকানপাটের বাঁশের ন্যাড়া খুটিগুলোই শুধু মাথা উচিয়ে আছে।

ফড়ে দু-চারজন যে আছে তা নেহাত দায়ে পড়েই বোধ হয়। আর সেই জন্যেই মেজাজ তাদের হয় তিরিক্ষি নয় গোঁজ।

যারা গোঁজ তারা কথা বললে কেউ উত্তরই দিতে চায় না।

নিজের গরজেই কারুর কাছে গিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করি। তার বিছানো সওদাগুলো দেখে নিই অবশ্য তার আগেই। সরষের দানা, পোস্ত, হলুদ, তিল এইসব নিয়েই তার বেসাতি।

আলাপটা তার ওপরেই চালাতে হবে। তবে প্রথমে গায়ে পড়ে আপনার জন হয়ে উঠে একটা মনগড়া সমস্যার পরামর্শ চাইলাম, ও ভালোমানুষের পো, এখানকার মানুষ-জন যেন কেমনতরো। পথে জ্বরে পড়ে এ হাটবারে পৌঁছোতে পারিনি। তাই আর হাটবার পর্যন্ত থেকে যেতে চাই। তা এ ক'দিনের একটা আস্তানার একটু খবর কেউ দিতে চায় না। এখানে কি ধরমশালা বলে ত কিছু নেই। ক'দিন নিজেই না হয় একবেলা ডালে-চালে ফুটিয়ে খাব। কিন্তু রাত্তিরটুকু মাথা গুঁজে থাকবার মত কোনও আস্তানা মিলবে ?

এতক্ষণ যে বকে মরেছি তা ভালো মানুষের পো পোস্ত হলুদ তিল সরষের ফড়ে একবার মুখ তুলে তাকায় নি। তাকে একটু মুখ তুলে চাওয়াবার জন্যেই কথাটা এমন টেনে লম্বা করেছি। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি তাতে। আমায় যেন চোখেই দেখতে পাচ্ছে না, ফড়ে বাবাজীর এমন মুখ গোঁজ করা অগ্রাহ্যি।

তার অগ্রাহ্যিটা যেন লক্ষ্যই করিনি এমন ভাব দেখিয়ে এবার বসেই পড়েছি বিছানো সওদাগুলোর এক পাশে। তারপর ফতুয়ার জেব থেকে বার্ডসাই এর বাক্স বার করে তা থেকে একটা বার্ডসাই এগিয়ে দিয়েছি ফড়ে বাবাজীর দিকে।

বলেছি—চলবে নাকি ?

এই ফিকিরে কাজ একটু হয়েছে। গোমড়া মুখ নরম হয়নি, কিন্তু ফড়ে বাবাজী হাত বাড়িয়ে বার্ডসাইটা নিতে অন্ততঃ গড়িমসি করেনি। সেটা নিয়ে চোখের সামনে দু আঙ্গুল ধরে এদিক ওদিক পাক দিয়ে ঘুরিয়ে যেন যাচাই করে নিয়ে বাবাজী সেটায় আমার জ্বালানো দেশলাইয়ের কাঠিটা ছোঁয়াতে দিয়েছে।

কিন্তু তাতেও লাভ যা হয়েছে বার্ডসাই এর ধোঁয়াটুকুর বেশি কিছু বোধহয় নয়।

আগে যা জিজ্ঞেস করেছি তা যেন ফড়ে বাবাজীর কানেই যায় নি। কথাটা আবার তাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি একটু ভনিতা করে।

—বলছিলাম কি চারটে দিন বাদেই ত পরের হপ্তার হাট। এ কটা দিন আবার টানা পোড়েন করে মরি কেন? এখানে এ ক'টা দিন থাকবার একটা জায়গা জোটে না ?

জবাব এবার মিলল। কিন্তু এ আবার কি রকম জবাব ?

বার্ডসাইটা হাতের মুঠোর ভেতরে কলকের মত ধরে ফড়ে বাবাজী একটি মাত্র বাক্যি ছাড়লেন বার্ডসাইটার বকশিশ হিসেবেই বোধহয়।

বাক্যটি এই—এখানে থাকতে নেই !

ভালো রে ভালো! তোর কাছে উপদেশ কে চাইছে !

এই ভেবে রেগে উঠতে গিয়ে হঠাৎ যেন টনক নড়ল।

আরে এই ত আমার লাইনে পড়া কথা! এখানে থাকতে নেই? কেন থাকতে নেই? থাকতে নেই ত লোকে আছে কি করে? ফড়ে বাবাজী নিজেই থাকে কোথায়?

প্রশ্ন ত অনেকগুলোই আসে। তার মধ্যে কোনটা আগে করলে আমার লাইনটা চালু থাকে?

গোলে পড়ে শেষেরটাই আগে তুলে বসলাম।

থাকতে নেই তবু থাকে ত কেউ কেউ। যেমন বাবাজীবন নিজে। তা বাবাজীবনের নিজের কোথায় থাকা হয়?

ফড়ে বাবাজীর তখন বার্ডসাইটাও শেষ হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে গলার ফুটোও এসেছে বুজে।

প্রায় না শোনার মত গলায় জবাব দিলে—তাতে কার কি দরকার?

সেই সঙ্গে শেষ হওয়া বার্ডসাই এর টুকরোটাও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার খাতিরটা এখন কি তাই বোধহয় বুঝিয়ে দিলে।

এখানে বসে গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টা করে আর লাভ নেই তাই উঠেই পড়লাম।

এবার আর কি করা যায়? গোমড়া মুখের কাছে এই খাতিরের পর তিরিক্ষী বাবাজীর কাছে যে কি খিঁচুনি শোনা যাবে, তাও জানাই আছে।

তবু দোনামোনা হয়ে ভাগ্যিস একবার কাছে গিয়ে কথাটা পেড়েছিলাম।

জবাবটা যেমন আচ করেছি তেমনি এল অবশ্য প্রথমে। দাঁত খিঁচুনি বেশ চিড়বিড়িয়ে উঠে তিরিক্ষি বাবাজী বললেন—না! না! থাকবার জায়গা-টায়গা জানি না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর আমার তিনকেলে সম্বন্ধী এসেছেন আমার সঙ্গে রসিকতা করতে; উনি বেনাপোলের হাটে থাকতে চান।

একেবারে তেলাকুচো-বাটা মাখানো গলাটা শুনেই চলে আসতে গিয়েও কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল।

তিরিক্ষী বাবাজী বলছে কি? এ দাঁতখিচুনির ভেতর যেন একটা কি অন্য ইশারা আছে।

ইশারাটা তিরিক্ষী বাবাজীর কথাটা শেষ হতেই ফুটে বেরুল।

বাবাজীর শেষ টিপ্পনিটা হল,—অত যদি চন্দ্রবিন্দুর সখ ত এখানে কেন? কলিমুদ্দির সওয়ারী হলেই পারেন।

কে কলিমুদ্দি? তার কিসের সওয়ারী? চন্দ্রবিন্দুর সখ বলতে আমি যা শুনে ছুটে এসেছি তাই বোঝাচ্ছে কি?

এ সব কিছুই জানবার আর উপায় নেই। আমায় দাঁত খিঁচুনিটুকু দিয়েই ফড়ে বাবাজী তখন তার ঝোলাঝুলি গুটিয়ে পাশে দাঁড় করানো বাঁশের ছোট ঠেলাটায় তুলতে শুরু করেছে। ঠেলাটা নিজেই কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে কে জানে। আমার দিক কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। জবাবের জন্য বার কয়েক মিথ্যেই সাধাসাধি করে শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেলাম।

যা করবার নিজেই এবার করব। আর কিছু না হোক চন্দ্রবিন্দুর নাম ত একবার শুনেছি। এখন কে কলিমুদ্দি, কেমন তার সওয়ারী হওয়া সারা রাত জেগে তাই অন্ততঃ দেখব।

অনেক পোড়ো ভিটেতে রাত কাটিয়েছি। উদোম মাঠ-ময়দানে শুয়ে থেকেছি সারা রাত। কিন্তু বেনাপোলের হাটতলা না ঘর, না ঘাট। না ভিটে, না মাঠ।

সেই জন্যেই ছমছমে অস্বস্তির ভাবটা অনেক বেশী।

ভাঙা হাটেরও আজ ছিল শেষ দিন। সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই গোঁজ আর তিরিক্ষী দুই ফড়েই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়েছে।

সব একেবারে খাঁ খাঁ। তার ওপরে একেবারে উদোম মাঠ না হয়ে একটুখানি মানুষ-জনের গন্ধ লেগে থাকা ব্যাপারীদের ফেলে যাওয়া ঘেরগুলোর নাঙ্গা বাঁশের খুঁটিগুলোর জায়গাটা কেমন যেন,

কেমন যেন—হ্যাঁ, ঠিক লাগসই কথাটাই পেয়েছি—কেমন যেন, মাথায় চন্দ্রবিন্দু লাগানো।

জনমনিষ্যি ত কোথাও নেই-ই একটা কুকুর বেড়ালও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকা হাটের এক কোণে গোলদারের একটা টিনের গুদোমঘর আড়-করা বাঁশের হুড়কো আর তালা দিয়ে বন্ধ করা। দমকা উত্তুরে হাওয়া মাঝে মাঝে তারই গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাথার টিনের চাল কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত গোঙানি গোছের শব্দ তুলে যাচ্ছে।

শীতের শুরু। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটা বাড়ছে। গরম চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়েও দমকা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এলে একটু কাঁপুনিই ধরছে।

এমন করে এই জায়গাটাতে রাত কাটানো খুব আরামের হতে পারে না। রাত্রে ঘুমোবার ইচ্ছে থাকলে উত্তরে হাওয়ার ঝাপ্‌টা এড়াবার জন্য গুদোম ঘরটার দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষেই শুতে হবে।

কথাটা মনে করেই নিজেকে একবার চাপড়াতে ইচ্ছে হল।

শুয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটাতেই এখানে এসেছি নাকি! এখন খোঁজ করতে হবে ত কলিমুদ্দির। সওয়ারী হতে হবে তার গাড়ির। তবেই চন্দ্রবিন্দুর সাধ মিটবে।

কিন্তু কোথায় করব কলিমুদ্দির খোঁজ? সে খোঁজ কি হাটতলায় চাদর জড়িয়ে বসে থেকে মিলবে? তার কি গাড়ি, কেমন গাড়ি, কিছুই জানি না। তবু সওয়ারী হবার গাড়ি যখন, তখন তা ত এই হাটতলার ওপর নয়, রাস্তাতেই চলবে।

খোঁজ করতে হলে সেই রাস্তাতেই করতে হয়।

কিন্তু তা বা কোথায় করব ভেবে ত কূল-কিনারা পেলাম না। বেনাপোলের এ হাটতলায় আসবার ত এই একটাই রাস্তা। রাজারঘাটে খেয়া পার হবার পর মাঠ বন বাদাড়ের ওপর দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ প্রায় হাড়গোড় ভাঙা এক গরুর গাড়িতে যে

এসেছি তাতে দূরে প্রায় লি-লি করা একটা জুটোর বেশি গাঁও চোখে পড়ে নি।

কলিমুদ্দির গাড়ি কি সেখান থেকে আসবে? তা ছাড়া আসবেই বা কোথা থেকে? আর সে সব গাঁ থেকে এলে নির্ঘাত গরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

সেই গরুর গাড়ির সওয়ারী হলেই চন্দ্রবিন্দুর সখ মিটবে? বিশ্বাস হোক না হোক, সে গাড়ির আশাতেই বসে থাকতে হবে।

তবে গরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছুই যখন হতে পারে না, তখন রাস্তায় গিয়ে না দাঁড়ালেও বোধহয় চলবে।

চারিদিকে শীতের কুয়াশা নেমে যেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তেমনি সব একেবারে নিস্তব্ধ। কলিমুদ্দির গরুর গাড়ি ত আর লাট-বেলাটের ল্যাণ্ডোবগী নয়। চাকার ক্যাঁচক্যাঁচানিতে এসে পৌঁছোবার অনেক আগে থেকেই জানান দেবে নিশ্চয়।

এই কথা ভেবে চাদরটায় মাথা পর্যন্ত আরও ভালো করে মুড়ি দিতে না দিতেই—হঠাৎ ও কি!

হ্যাঁ, গাড়িরই শব্দ। কিন্তু ক্যাঁচক্যাঁচানি ত নয়, এ যে স্পষ্ট ঘোড়ার ক্ষুরের নালের খট্ খটা খট্!

কলিমুদ্দি ঘোড়ার গাড়িই চালিয়ে আসছে তা হলে! কোথা থেকে কেমন করে তা সম্ভব, সে সব ভাববার তখন আর সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে চাদর সামলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঠিক রাজারঘাটের দিক থেকেই শব্দটা আসছে। জোড়া ঘোড়ার পায়ের খট্ খটা খটের সঙ্গে পুরানো নড়বড়ে গাড়ির ঝড়ঝড়ে আওয়াজ। গাড়ির তলায় ঝোলানো মিটমিটে আলোটাকেও জুলে জুলে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

হাতটা তুলে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু গাড়িটা যেন নিজের থেকেই থামল।

বেশ কাছে এসে দাঁড়ালেও অন্ধকার কুয়াশায় গাড়িটা ভালো

করে দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার গায়েই যেন একটা ঝাপসা কালো ছোপ পড়েছে মনে হচ্ছে।

গাড়িটা ঝাপ্‌সা হলেও কানে আওয়াজ এবার যেটা এল সেটা একেবারে স্পষ্ট।

—কেরায়া যাবেন কর্তা?

কেরায়া?—প্রথমটায় একটু চমকে উঠলেও বেশ ব্যস্ত হয়েই তারপর জানালাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেরায়া যাব। তুমি, মানে তোমার নাম কি কলিমুদ্দি?

—হ্যাঁ, কর্তাবাবু। তা আপনি যাবেন কোথা?

তাই ত? কোথায় যাব এখন বলি! গাড়ির ওপরে গাড়োয়ানের আসনে কলিমুদ্দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে আমতা আমতা করে বললাম—আমি যাব মানে, আমার একটু ওই কি বলে …

—বুঝেছি কর্তা। কলিমুদ্দি আমায় ফ্যাসাদ থেকে বাঁচালে—জায়গার নামটা মনে করতে পারছেন না। ও রকম ভুল সকলেরই হামেশা হয়। তা, আপনার কোনো ভাবনা নেই। আপনি গাড়িতে চড়ে বসুন। ঠিক জায়গায় আপনাকে পৌঁছে দেব।

হ্যাঁ, এই চন্দ্রবিন্দুর দেশের মত কথা বটে!

—কিছু না জেনে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে তুমি?—অবাক যেমন তেমনি খুশিও হয়ে বললাম;—তা তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?

—আজ্ঞে কর্তা, আমি ত সামনে বাগেই যাই।

জবাব দেবার ধরনে আমার প্রশ্নটা কলিমুদ্দির খুব পছন্দ হয়নি মনে হল। তাড়াতাড়ি তাই সামলে নিয়ে বললাম,—ঠিক আছে। ঠিক আছে। সামনে পেছনে যে বাগেই যাও, আমায় পৌঁছে দিলেই হল। তোমায় ভাড়া কত দেব এখন বলো।

—সে আপনার যেমন খুশি দেবেন। একটু অধৈর্য যেন ফুটে উঠল কলিমুদ্দির গলায়—এখন গাড়িতে ওঠেন ত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ উঠছি।—গাড়ির পা-দানে একটা পা তুলেই বললাম কিন্তু ভাড়াটা আগে ঠিক করে নেওয়াই ভালো কলিমুদ্দি। তাহলে পরে আর গোলমাল হয় না। তুমি কত চাও তাই বলো।

—কত চাই বলব।—কলিমুদ্দির মুখখানা ত দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গলায় যেন একটু হাসির আভাস পেলাম,—পয়সা-কড়ি কিছুতেই ত আমার কাজ নেই কর্তা। আপনি বরং যা আপনার দরকার নেই তাই আমায় দেবেন বকশিশ বলে।

—যা আমার দরকার নেই তাই দেব। এ তো বড় মজার কথা। কি আমার সঙ্গে এমন আছে যাতে আমার দরকার নেই ?

ফাঁপরে পড়ে দুচার লহমা বুঝি চুপ করেছিলাম। আমার ফাপরে পড়া বুঝে কলিমুদ্দি নিজে থেকেই মুশকিলটা আসান করে দিলে। বললে—আপনার গায়ের ওই মলিদাটা দেবেন কর্তা, তা হলেই হবে।

মলিদাটা দেব ? বলে কি কলিমুদ্দি! এই শীতে মলিদাটাই আমার অদরকারী জিনিস হল নাকি !

কিন্তু এমনিতেই সময় অনেক গেছে। মলিদা নিয়ে কিছু বলতে গেলে আরো দেরী হয়ে যায়।

কিছু না বলে গাড়ির ভেতর তাই চড়ে বসলাম। বসবার সঙ্গে সঙ্গে কলিমুদ্দির ছিপটির আওয়াজও পেলাম গাড়ির ওপর থেকে। সেইসঙ্গে জোড় ঘোড়ার নাল বাঁধা আট পায়ের খট্ খটা খট্ও।

বাইরেটার চেহারা যেমনই হোক, কলিমুদ্দির গাড়ির ভেতরটায় কিন্তু খুঁত ধরবার কিছু নেই। বসবার গদি বেশ পুরু আর নরম। গাড়ির গায়েও চারিদিকে কাঁধ পর্যন্ত গদি আঁটা। তাতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নেওয়াও যায় একটু।

গাড়িটি দোলানিতে তেমনি একটু তন্দ্রার ভাব এলেও কিছুতেই ঘুমোব না বলে তখন ঠিক করেছি। সারাক্ষণ জেগে সবকিছু আমার খেয়াল করা চাই।

চোখে দেখবার অবশ্য কিছু নেই। গাড়ির দুদিকের দরজার

ওপরকার খড়খড়ি দুটোই শুধু খোলা। তা দিয়ে গাড়ির চাকার আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এলেও চোখে কিছুই দেখবার নেই।

শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, যেন অন্ধকারেরই স্রোত দুদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে ত যাচ্ছেই, তার আর কোন অদল-বদল নেই···কিন্তু এ কি!

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে পেলাম, গাড়ির চাকার শব্দ কই? জোড়া ঘোড়ার আট পায়ের খট্ খটা খট্ আর মাঝে মাঝে কলিমুদ্দির ছিপটির আওয়াজ?

তার বদলে ঝম্‌ঝমাঝম্ এ কি মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ! সেই শব্দই কি আর সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে?

কিন্তু বৃষ্টি আরম্ভ হল কখন? পৌষ মাসের গোড়ায় এমন আকাশ ফুটো করা বৃষ্টি আবার হয় নাকি!

মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরের অন্ধকার বেশ একটু ফিকে হয়ে আসছে বুঝতে পারছি। রাত কেটে তাহলে ভোর হয়ে আসছে। মাঝখানে সারারাত আমি ত তাহলে অঘোরে ঘুমিয়েছি দেখছি! কখন বৃষ্টি এসেছে, কখন থেমেছে, কিছুই টের পাই নি। কতক্ষণ গাড়িটা থেমে আছে? গাড়ি থামিয়ে কলিমুদ্দি করছেই বা কি?

—কলিমুদ্দি! কলিমুদ্দি!

ভেতরের ডাক কলিমুদ্দির কানে পৌঁছোচ্ছে না বোধ হয়। বৃষ্টিটা ধরে গিয়ে দিনের আলো বেশ ভালো করেই ফুটেছে এখন। কলিমুদ্দিকে ভালো করে ডাকবার জন্যে জানালা থেকে মুখ বাড়ালাম।

মুখ বাড়িয়ে একেবারে তাজ্জব। কোথায় কলিমুদ্দি, শুধু কলিমুদ্দিই নয়, গাড়িতে ঘোড়াগুলোও ত জোড়া নেই! আমার ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির জন্যেই সেগুলো খুলে নিয়ে কলিমুদ্দি কোথাও অপেক্ষা করছে নাকি?

না, এখন একবার গাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু গাড়ির

এধার-ওধার দুদিকের দরজা এমন আঁট হয়ে গেল কি করে? মরচে ধরে গেছে যেন হাতলের কব্জায়। রাত্রের অন্ধকারে যেগুলো অত ভালো মনে হয়েছিল, সে গদিগুলোও ত দেখছি ছেঁড়াছোড়া ভেতরের ছোবরা বার করা।

কোন রকমে লাথি মেরে পায়ের জোরে দরজা খুলে বেরিয়ে অবাক। গাড়িটা এ কোথায় পড়ে আছে! রাস্তায় নয়, রাস্তার ধারের একটা আগাছার জঙ্গলের মধ্যে। গাড়ির যেমন চেহারা তার হালও তাই। দু-দুটো চাকাই দেখছি খোলা।

সব কি ওই আমার ঘুমিয়ে পড়া রাতটুকুর মধ্যে হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছি না জায়গাটাও। মনে হচ্ছে কোনো ছোটখাট মফঃস্বলী শহরের বাইরের দিকে এসেছি। কিন্তু কোথায় কোন্ শহর? তাছাড়া রাস্তায় এত জল কাদা কেন? বৃষ্টি এখনকার মত থামলেও আকাশের আর পথঘাটের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, বৃষ্টি আগেও বেশ ক'দিন হয়েছে আর এখনও যথেষ্ট হবে। পৌষ মাসের গোড়ায় এমন নাগাড়ে বৃষ্টি হয় নাকি! তা ছাড়া বেনাপোলের হাটতলা থেকে রাতটুকুর মধ্যে কতটাই বা এসেছি? সেখানে একেবারে খটখটে শুকনো, আর ক'ঘণ্টার পথ এসেই এমন ঘোর বর্ষা! শীতের বর্ষার ঠাণ্ডা ত নেই-ই, রীতিমত গরমই ত হচ্ছে।

গরম লাগাটা টের পেতেই গায়ের মলিদার কথাটা খেয়াল হল। গাড়ির দরজা খুলে নামবার সময় সেটা গায়ে দিয়ে নামি নি। গাড়ির ভেতরই পড়ে আছে তা হলে।

তাড়াতাড়ি তাই দেখতে গেলাম। মলিদা সেখানে নেই।

না, এবার আর অস্থির না হয়ে মনে মনে একটু হাসলাম শুধু। কলিমুদ্দি তার বকশিশ তাহলে ঠিকই নিয়ে গেছে। আমার দরকার যা তেমন জিনিসই নিয়েছে। কিন্তু ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে কি?

যেদিক থেকে এসেছি এতক্ষণ বাদে সেই বেনাপোলের দিক থেকেই একটা গরুর গাড়িকে আসতে দেখে সেটা থামালাম।

জিজ্ঞেস করলাম,—কোথা থেকে আসছ বাছা ?

—আজ্ঞে উই উধারের গাঁ বেনাপোল থেকে।—গাড়োয়ান একটু অবাক হয়েই জবাব দিলে।

—ওদিক পানে বৃষ্টি-টিষ্টি পেলে ?

—আজ্ঞে বলেন কি কর্তা, বর্ষাকাল বৃষ্টি পাব না! লোকটা আমায় একটা পাগল বলেই ঠাউরে গরুর ল্যাজ মলে তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেল।

প্রশ্নটা অনেক ভেবে-চিন্তেই কিন্তু করেছিলাম। উত্তর পেয়েই যা বোঝবার বুঝে নিয়েছি।

বটকেষ্ট তাহলে ভুল খবর আনে নি। সত্যিই মাথার ওপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া মুল্লুকই এটা বটে। কলিমুদ্দি তাই এক রাতের সওয়ারী করে আমায় শীত থেকে একেবারে বর্ষায় এনে দিয়ে গেছে।

শহরের দিক থেকে কে একজন আসছে।

কোথায় নিয়ে এসেছ তা কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করব না। আমার খুলনোর বদলে মালদো জেলার কোন শহরের পাছে নাম করে বসে, এই আমার ভয়।

শীত থেকে বর্ষায় এসে পৌঁছোনটাই আগে সামলে নিই।

# ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ

সুনীল সেদিন বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে ফিরেছে। চিরকালই সে ডানপিটে, তার ওপর বিজ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে দেখবার পর ভয়-ডর তার আর কিছু থাকবার কথা নয়। তবু এখনো ব্রহ্মদৈত্যের মাঠের কথা শুনলে সে শিউরে ওঠে।

কেন যে ওঠে, সেই গল্পই আজ তার কাছে যেমন শুনেছি, বলব।

সুনীল বলে—

আমাদের শহরতলীর ভেতর দিয়ে যে লম্বা সিধে সড়কটা নদীর ধার পর্যন্ত গেছে, তার দক্ষিণ পাশে ছিল ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ। প্রকাণ্ড পতিত জমি; তাতে না ছিল মানুষের বসতি, না ছিল গাছপালা। শুধু শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করত।

এমন শূন্য মাঠ হয়তো অনেক জায়গাতেই আছে; কিন্তু এ-মাঠের ভারী বদনাম ছিল। সে বদনামটা যে কি, তা আমরা ভালো করে কেউ জানতাম না; তবু দিন-দুপুরেও সে-মাঠের পাশ দিয়ে যেতে আমাদের গা ছমছম করত। নানারকম কথাই সে মাঠ-সম্বন্ধে শোনা

যেত। কোন্‌টা যে সত্যি, তা আমরা বুঝতে পারতাম না। কেউ বলত যে, সে-মাঠ নাকি কোন মানুষের পার হওয়ার সাধ্যি নেই। সে দুঃসাহস করতে গিয়ে কত লোক নাকি আশ্চর্যভাবে মাঠের মাঝখানে দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার কোথাও কোথাও শোনা যেত যে, সে-মাঠে গভীর রাতে লাল-আলখাল্লা-পরা এক দীর্ঘদেহ বুড়ো লোক ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার দুর্ভাগ্য যার হয়, তার নাকি আর রক্ষে নেই। এমনি সব নানান গুজব শুনে এই মাঠ সম্বন্ধে আমাদের ভয়ের আর সীমা ছিল না। নদীর ধারে নবাবগঞ্জে আমাদের স্কুল। সড়ক দিয়ে না গিয়ে এই মাঠ পার হয়ে গেলে অনেকটা সময়ের সুসারও হত; কিন্তু অত্যন্ত 'লেট' হ'য়ে গেলে মাস্টারমশাইদের রক্তচক্ষু স্মরণ করেও আমরা সে-মাঠ পার হয়ে যাওয়ার সাহস সংগ্রহ করতে পারতাম না।

★ ★ ★

এই ভয়ঙ্কর মাঠই কিন্তু একদিন হঠাৎ আমাদের তীর্থস্থান হয়ে উঠল।

একদিন সকালে উঠে হঠাৎ চম্‌কে শুনলাম, বাড়ির ধার দিয়ে ছ্যাকরা-গাড়িতে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সার্কাসের দল চলেছে। অনেক রকম বাজনাই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু ছেলেবেলায় যে ছ্যাকরা-গাড়িতে সার্কাসের প্ল্যাকার্ড টাঙ্গানো থাকে এবং যার ভেতর থেকে পৃথিবীর দাতাশ্রেষ্ঠ দাতা অমনি হ্যাণ্ডবিল বিলি করে যায়, তার ব্যাণ্ডের মত মধুর বাজনা আর কোন কিছুই বোধ হয় নেই।

অনেক কাকুতি-মিনতি করে ছ্যাকরা-গাড়ির পেছনে পেছনে বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ে একটা হ্যাণ্ডবিল জোগাড় করে পড়ে জানলুম যে, আমাদের শহরে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বিশ্বস্তর সার্কাস আমেরিকায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার আগে অনুগ্রহ করে কয়েকদিনের জন্যে খেলা দেখিয়ে যাবে।

প্রবেশ-মূল্য সবচেয়ে কম দেখলাম চার আনার এবং তারই সঙ্গে 'বিলম্বে হতাশ হইবেন' এই সতর্কবাণী পড়ে ঠিক করলাম, যেমন করেই হোক এ-সার্কাস দেখতেই হবে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই হ্যাণ্ডবিলের বাকিটা পড়ে মন একেবারে দমে গেল। দেখলাম, সার্কাস হবে এই মাঠে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখবার লোভেও এই মাঠে যেতে মন সরছিল না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোভেরই জয় হ'ল। ভাবলাম শহরশুদ্ধ লোক তো যাবে, তবে ভয় কিসের!

বাড়িতে কাউকে অবশ্য জানালাম না। জানালে আর রক্ষে থাকত না। খেলা হবে দু'বার, সন্ধ্যায় আর রাত ন'টায়। কিন্তু নানান ফন্দি-ফিকির করেও বাড়ির গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে সন্ধ্যার খেলায় যেতে পারতাম না। ন'টার খেলা দেখতে যাওয়ার জন্যে বেশী সাহস দরকার, কিন্তু সুবিধে অনেক। মনে মনে সেই সঙ্কল্পই করলাম। আমাদের শোবার ঘরটা একেবারে বাড়ির একধারে। কোনরকমে তাড়াতাড়ি পড়াশুনা সেরে সেদিন মাথা-ধরার নাম করে শুয়ে পড়লাম। এ-ঘরে বড় দাদা ছাড়া আর কেউ শোয় না। তিনিও অনেক রাত্রে এসে একেবারে কোনদিকে না চেয়ে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। মাকে বললাম—মাথা ধরার জন্যে চোখে আলো সহ্য হচ্ছে না। মাও সরল বিশ্বাসে আলোটা সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আর আমায় পায় কে? মশারিটা ফেলে বেশ ক'রে চারধারে গুঁজে দিয়ে জানালা বেয়ে একেবারে পথে। এই মাঠের নামে যেটুকু ভয় ছিল, সার্কাসের কাছে পৌঁছে লোকের ভীড়, আলো ও আয়োজনের ঘটায় সে কোথায় যে উবে গেল, তার পাত্তাই পেলাম না। এ যেন সে-মাঠই নয়। রাতারাতি আলাদিনের প্রদীপ থেকে যেন তার ওপর এক মায়ানগর বানিয়ে দিয়েছে কে!

কি আশা-আকাঙ্ক্ষা-কৌতূহল নিয়ে যে লম্বা গ্যালারির সকলের চেয়ে উঁচু বেঞ্চির একধারে গিয়ে বসলাম, তা বলতে পারি না। নিজের

সৌভাগ্যে নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সার্কাস আরম্ভ হওয়ার আগে হয়তো কি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, সার্কাস দেখা আমার ভাগ্যে আর হবে না।

কিন্তু নির্বিঘ্নে সার্কাস আরম্ভ হয়ে গেল।

বরাবর আমার সকাল সকাল শোয়া অভ্যাস; কিন্তু নতুন খেলার পর খেলা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখতে দেখতে ঘুম যে কোথায় উড়ে গিয়েছিল সেদিন বলতে পারি না। ক্লাউনদের ভাড়ামিতে হাসতে হাসতে সেদিন নাড়ী ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। ট্রাপিজ খেলোয়াড়দের অসীম সাহস দেখে সভয়ে তারা এই বুঝি পড়ল মনে করে কতবার যে চোখ বুজলাম বলতে পারি না। জানোয়ারদের অদ্ভুত শিক্ষা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সব খেলাই ভাল—শুধু ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা একেবারে বিরক্তিকর। এক-একবার ঘোড়ার খেলা আরম্ভ হয়, আর বুঝতে পারি, কি দারুণ ঘুমে চোখ আমার জড়িয়ে এসেছে।

সার্কাস শেষ হতে তখন বোধ হয় বেশি দেরি নেই। সার্কাস-ম্যানেজার নিজে সেই একঘেয়ে ঘোড়ার খেলা সুরু করেছে। দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে। মনে মনে কখন তা শেষ হবে ভাবছি, এমন সময় মনে হ'ল ঘোড়াগুলো যেন রিংএর ভেতর নেই, গ্যালারিময় ছড়িয়ে পড়ে তারা অত্যন্ত সহজে কাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল আমি যেন রিং-এর মাঝখানে কেমন করে এসে পড়েছি এবং আমায় ঘিরে বিদ্যুৎবেগে

ঘোড়াগুলো ঘুরছে। শুধু ঘুরছে নয়, ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ তারা আমার একেবারে কাছে ঘেঁষে আসছে—আর একটু এলেই তারা একেবারে আমার গায়ের ওপর এসে পড়বে। আমি চিৎকার করে উঠলাম।···

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, অন্ধকার—চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। সাতপুরু কালো-পর্দায় চোখ ঢেকে রাখলেও বোধ হয়, চোখে এত অন্ধকার দেখা যায় না। আশে-পাশে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম, আমি সেই গ্যালারির কাঠের বেঞ্চির ওপরই কাত হয়ে শুয়ে আছি। অথচ আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই!

যে সার্কাস আলোয়, মানুষের কোলাহলে জমজমাট হয়েছিল, তার চিহ্নই কোথাও নেই। খালি অন্ধকার—আর সেই অন্ধকারে ভিজে কাঠের গুঁড়োর কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

বুঝলাম, ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর কখন যে সার্কাস ভেঙ্গে গেছে, কখন যে সমস্ত লোকজন চলে গেছে, কখন সার্কাসের লোকেরা সমস্ত বাতি-টাতি নিভিয়ে চলে গেছে, কিচ্ছুই টের পাইনি। আশ্চর্যের কথা এই যে, সার্কাসের লোকেরাও আলো নেভাবার আগে আমায় দেখতে পায়নি।

কিন্তু কেন যে পায়নি, সে-কথা ভেবে এখন কোন লাভ নেই। বিরাট তাঁবুর ভেতর অন্ধকারে আমি একলা—এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। বাইরে বোধহয় তখন ঝড় না হোক, খুব জোরে হাওয়া বইছে। সমস্ত সামিয়ানাটা সে হাওয়ায় দুলে উঠে এমন একটা অমানুষিক শব্দ হচ্ছিল যে, আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত শিউরে উঠতে লাগল।

মনে পড়ল—এই তাঁবুর বাইরেই সেই ভীষণ মাঠ। এই নিশুতি রাতে সেখানে জনমানব নেই—শুধু অন্ধকার; কিন্তু তাঁবুর ভেতরেই বা কি করে থাকা যায়। আমি হাতড়ে গ্যালারি দিয়ে নামলাম, কিন্তু কোন্ দিকে যাব? ধীরে ধীরে দু'পা এগুতেই হঠাৎ হোঁচট

খেয়ে পড়ে গিয়ে দেখলাম, তাঁবুর একটা খুঁটির দড়িতে পা জড়িয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে দড়ি ছাড়িয়ে আর একটু যেতে গিয়ে আবার গোটাকতক চেয়ারে সজোরে ধাক্কা লাগল।

এবারে আর আমি থাকতে পারলাম না। সজোরে চিৎকার করে উঠলাম। সে চিৎকার-শব্দ নিস্তব্ধ তাঁবুর ভেতর এমন অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যে, মনে হ'ল সে আমার গলার শব্দ নয়। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—কেউ সাড়া দেয় কিনা দেখবার জন্যে—কিন্তু কোথায় কে ?

হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হ'ল আমার অত্যন্ত নিকটে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। কাঁপা গলায় বললাম—"কে ?" কোন সাড়া নেই! তেমনি ফিস্‌ফিস্ শব্দ অত্যন্ত কাছে।

অত্যন্ত ভয়ের সময় মানুষের একটা সাহস যেন কোথা থেকে আসে। মরিয়া হ'য়ে হাত বাড়ালাম।

কিছুই নয়। দেখি একটা থামের গায়ে একটা কাগজ আঁটা ছিল; তারই খানিকটা খুলে গেছে এবং সামান্য হাওয়ায় সেটা নড়ে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। আমি এই শব্দটাকেই বোধহয় ফিস্‌ফিস্ কথা বলে মনে করেছিলাম। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে একটু বলও পেলাম। মিথ্যে ভয় আর করব না—এ তাঁবু থেকে বেরোবার পথ আমায় বের করতেই হবে।

হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কাগজ ছিঁড়ে ফেলা সত্ত্বেও সেই ফিস্‌ফিস্ শব্দ। এবার অপর দিকে। শুধু শব্দ নয় তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে মনে হ'ল, যেন আগুনের মত লাল দুটো চোখ এতক্ষণ জ্বলছিল, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। সমস্ত শরীর ভয়ে অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রাণপনে চিৎকার করে বললাম—"তাঁবুতে কে আছ সাড়া দাও।" তবু সমস্ত নিস্তব্ধ।

এই নিশুতি রাতে অন্ধকারে এই তাঁবুর ভেতর কি যে করব, কোথায় যে যাব, ভেবে না পেয়ে ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল।

গ্যালারির বেঞ্চি ধরে এবার বেরোবার পথ খোঁজবার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম যেখানে বেঞ্চি শেষ হয়েছে, সেইখানেই নিশ্চয় পথ পাওয়া যাবে ; কিন্তু আশ্চর্য ! বেঞ্চি ধরে ধরে যতদূর যাই, কোথাও তা আর শেষ হতে চায় না। মনে হ'ল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি এমনি ঘুরেছি, তবু বেঞ্চির আর শেষ নেই।

ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছিল না। হতাশ হয়ে অন্ধকারে বসে পড়লাম। তখন সত্যি ভয়ে-ভাবনায় আমি কেঁদে ফেলেছি ; কিন্তু সেখানে কাঁদলে শুনছে কে ? জেনে নিজেই চুপ করলাম। এবার মনে হ'ল কে যেন সার্কাসের ভেতর চলে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্।

ডাকলাম—"কে ?"

পায়ের শব্দ সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল ; কিন্তু খানিক বাদেই শুনলাম দূরে আবার সেই পায়ের শব্দ।

আবার ডাকলাম—"কে ? কোন উত্তর নেই, মনে হ'ল একটা যদি আলো থাকত এ-সময়ে। আমার মনে আলোর কথা উঠতে না উঠতে আশ্চর্য হয়ে দেখি, সার্কাসের মাঝখানে একটা আলো জ্বলে উঠেছে। সে আলোয় সমস্ত সার্কাস অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শূন্য গ্যালারি, শূন্য সমস্ত চেয়ার, শুধু একলা আমি সার্কাসের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

না, একলা তো আমি নই। আমার মুখোমুখি ওধারের গ্যালারিতে একটা লোক মাথা নিচু করে বসে আছে যে। আনন্দে বুকটা লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে ডাকলাম—"শুনুন মশাই !" লোকটা তবু মাথা তুলল না দেখে ভাবলাম, হয়তো অন্যমনস্ক আছে বলে শুনতে পায়নি। ছুটতে ছুটতে তার কাছে গিয়ে ডাকলাম—"শুনুন।"

লোকটা এবার মুখ তুলে তাকাল। প্রথমে তার চাউনিটা অদ্ভুত মনে হল; কিন্তু খানিক আমার দিকে চেয়ে থেকেই সে হো হো করে হেসে উঠে বললে—"অ্যা, তুমি এসেছ, তোমার জন্মেই তো বসেছিলাম।"

এ আবার কি বলে? হয়তো ভুল করেছে, ভেবে বললাম—"আমি সার্কাসের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখন বাড়ি যেতে পারছি না।"

লোকটা আবার হো হো করে বিকটভাবে হেসে উঠে বললে—"বাড়ি যেতে পারছ না? বোসো, বাড়ি যাবে কি? কতদিন ধরে তোমায় খেলা দেখাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, আমার খেলা দেখে যাও।"

তার চোখ দেখে সভয়ে দু'হাত পেছিয়ে এলাম। এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল। বুঝলাম, তার হাত-ছাড়ানো সহজে সম্ভব নয়।

ভয়ের ভেতরও বুদ্ধি করে এই পাগলকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললাম—"তোমার খেলা তো এই খানিক আগেই দেখলাম। আমায় পথ দেখিয়ে দাও।"

লোকটা মাথা নেড়ে বললে—"উঁ হুঁ আমার খেলা দেখোনি। ওরা কি আর আমায় খেলা দেখাতে দেয়। দাঁড়াও, চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ।"

তারপর আর বাক্যব্যয় না করে লোকটা একটা ঝোলানো দড়ি বেয়ে সটান ওপরে উঠে গেল। বহু উচ্চে সামিয়ানার মাথা থেকে একটা ট্রাপিজ ঝোলানো ছিল। লোকটা দড়ি বেয়ে সেই ট্রাপিজে গিয়ে উঠল। তারপর দেখি ভয়ঙ্কর দোলা। নীচের দিকে মাথা করে ট্রাপিজ দুলিয়ে একেবারে সার্কাসের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকটা সবেগে দোল খেতে খেতে নানারকম কসরৎ

দেখাতে লাগল। এ-লোকটা কিরকম পাগল বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়। হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যা ভাবলে এখনও হৃদ্‌কম্প হয়। ট্রাপিজের দড়ি সহসা ছিঁড়ে গেল এবং সেই তাঁবুর মাথা থেকে লোকটা ছিটকে গ্যালারির একধারে চিৎকার করে পড়ে গেল। আতঙ্কে চিৎকার করে আমিও সেই দিকে ছুটে গেলাম। মনে হোলো, গ্যালারির কাঠের ওপর পড়ে লোকটার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

কাছে গিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। লোকটা অক্ষত শরীরে সেই বেঞ্চির ওপর বসে আছে। না অক্ষতশরীর ঠিক তো নয়! তার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। তার মুখের নিচের দিকটা—একবারে সেই গলা থেকে ওপরের মাড়ি পর্যন্ত একেবারে ফাঁক। চিবুকবিহীন মুখে লোকটার দাঁতগুলো বিকটভাবে বেরিয়ে আছে। আমার ভয় দেখে লোকটা হাত বাড়িয়ে একটা কি কুড়িয়ে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে বললে—"নাও, এবার হয়েছে তো। ওটা আমার কেবলই খসে যায়, সেই যে ত্রিশ বছর আগে খসে গেছে এখনও জোড়া লাগল না।"

তার মুখ দেখি আবার জোড়া লেগে স্বাভাবিক হয়ে গেছে; কিন্তু স্বাভাবিকই হোক আর অস্বাভাবিকই হোক আমার দেখবার সাহস আর ছিল না। কোনদিকে না চেয়ে আলো থাকতে থাকতে প্রাণপণে ছুটে আমি সার্কাসের একটি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু বেরোলে কি হয়! সার্কাসে যদি বা আলো ছিল, এখানে দারুণ অন্ধকার। এই অন্ধকারে এই মাঠ পেরিয়ে কোন্ দিক দিয়ে বাড়ি যাব, ভেবে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় অত্যন্ত কাছে কার গলার আওয়াজ পেলাম—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ

হতভাগা ? আমি এই অন্ধকারে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি। চ' বাড়ি চ'।"

ওমা। এযে বড়দার গলা !

আমার পলায়ন তাহলে তো জানাজানি হয়ে গেছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তার জন্যে যথেষ্ট বকুনি ও মার খেতে হবে। জেনেও কিন্তু তখন আনন্দে আমার গলা ধরে এসেছিল। শুধু বললাম —"চলো দাদা।"

অন্ধকার পথে দাদা আগে আর আমি পিছে কতক্ষণ যে চলেছি বলতে পারি না। সামনে একটা উঁচু পুকুরের পাড়ে দাদাকে উঠতে দেখে বললাম—"দাদা, এ কোথায় এলে ? এ পথ তো নয় !"

"হ্যাঁ এই পথ।" থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ তো দাদার কণ্ঠস্বর নয়। এবার অন্ধকারের ভেতরেও দেখতে পেলাম—সামনে যে দাঁড়িয়ে তার দীর্ঘদেহ রাঙা একটা আলখাল্লায় ঢাকা। মাথায় তার লম্বা গোল টুপি, ধীরে ধীরে সে আমার দিকে ফিরে দাড়ালো, কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার আগেই আমি মুর্ছিত হয়ে পড়লাম।

সকালে চোখে আলো লেগে যখন জ্ঞান হল তখন দেখি— প্রকাণ্ড একটা দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর আমি শুয়ে আছি। অজ্ঞান অবস্থায় আর একটু হলেই গড়িয়ে একেবারে দীঘির অতল জলে তলিয়ে যেতে পারতাম। যাইনি, এই আশ্চর্য। এ দীঘি আমি চিনি। এই মাঠের একেবারে একপ্রান্তে, যেখানে সার্কাস, তার প্রায় এক ক্রোশ দূরে এর অবস্থান। রাতে যা যা দেখেছি, তা যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে কেমন করে যে এত দূরে এসে পড়লাম, বোঝা শক্ত। যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন বেলা ন'টা। আমার অবস্থা দেখে মা বললেন—"হ্যারে, ভোরে উঠেই কোথায় গিয়েছিলি বল্‌তো ? সর্বাঙ্গে কাদা-ধূলো শুক্‌নো।

বুঝলাম আমার পালানো মোটেই ধরা পড়েনি; কিন্তু মনে হোলো, পড়লেই ভালো ছিল।
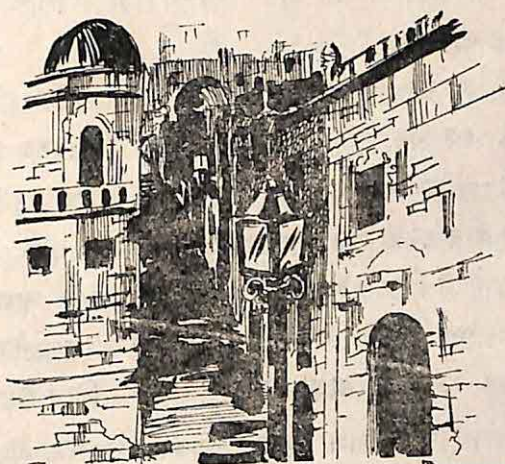
# কলকাতার গলিতে

বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে তুপুর-রাতে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিনক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়াপোড়ান মাঠ সে কতবার বাজি ধ'রে নিয়ে এসেছে; কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে তু'পা এগুতে হ'লে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসলাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নাই ব'ললেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে প'ড়েছিল তা জীবনে ভোলবার নয়।

বিশ্বনাথ বলে—"না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরোন নিরাপদ নয়।"

আমরা হেসে উঠলে বলে—"না হে না, চৌরঙ্গী, সেন্ট্রাল-অ্যাভেনিউ-এর কথা ব'লছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গী নয়। শোন তাহ'লে—"

"সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরীর জন্যে বই কিনতে গিয়েছিলাম,। ভেবেছিলাম, এক দিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাতের ট্রেনেই বাড়ী চলে আসব ; কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ থিয়েটার না দেখে কেমন করে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেল্‌লাম। সঙ্গে বিছানাপত্র বা তোরঙ্গ-বাক্সের ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটিমাত্র সুটকেশ, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হত।

কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হোলো, একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। ইস্কুলে আমার সঙ্গেই পড়া-শুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশীদিন অবশ্য কলেজে থাকেনি। অত্যন্ত খেয়ালী ছেলে —কোন কাজে বেশীদিন লেগে থাকবার মত ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ী থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বড় হয়েও তার সে স্বভাব যায়নি। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন হয়তো শুনলাম অবিনাশ হেটে সেতুবন্ধ যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়তো দু'মাস তার দেখা নেই। আমরা কোনরকমে প্রক্সি দিয়ে হয়তো সেবার তার কলেজের খাতায় কামাইএর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম ; কিন্তু এমন করেই বা কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে এগ্‌জামিনেশনের সময়ে দেখা গেল, অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কমদিন এসেছে যে, তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে-এত মিশুকে ছিল যে আমরা সবাই তাকে ভালবাসতাম ; কিন্তু অবিনাশের

যেন স্ফূর্তিই হলো। বললে—'তবে আর কি? বর্মাটা একবার ঘুরে আসি ভাই! তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই! আমাদের থেকে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড়, এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকতো। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে-দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশ আর মিটতে চাইতো না। যে-সব দেশ সে এখনো দেখেনি, তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে, আমাদেরও কখন কখন মোহ ধরে যেতে—কেমন যেন মনে হত, এই ছোট্টো শহরের ছোট্টো জানা কটি রাস্তায় দু'বেলা যাওয়া-আসায় জীবনের কোন সার্থকতাই নেই-পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কুল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বুক ভরে বড় করে নিঃশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

আমাদের এই ক্ষনিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত, কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস-তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশেরই একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে, অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে সে কলকাতার এই ঠিকানায় আপাততঃ আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়তো যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হোল।

বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু গলিটার নাম মনে ছিল। ট্রেনেরও এখন দেরী
ভাবলাম, কলেজ স্ট্রীট থেকে বেশী দূর হবে না।
আছে। একবার দেখা করেই যাই, যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর—একটা গলি-রাস্তায় ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে, তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশী নয়। বড়জোর আটটা হবে; কিন্তু গলি দিয়ে

খানিক দূর হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক, আর যাই হোক, কলকাতার পথ তো বটে। অথচ এই আটটা-রাতে সেখানে একটা জন-প্রাণীও নেই।

ভেবেছিলাম, খানিকদূর গিয়ে আবার কাউকে পথের কথা জিজ্ঞেস করব; কিন্তু লোক কোথায়? তাছাড়া গলিটাও যেন ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হোল, হয়তো ভুল-পথে এসেছি; কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে, আমায় ভুল-পথ দেখিয়ে তার লাভ কি? নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি-এমন লাখ-পঞ্চাশ টাকা আছে যে, চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোশাক দেখেও বড়লোক বলে ভুল করবার কোন সম্ভাবনাও নেই! তবে?

আরো খানিকটা এমনি করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জন! বাতিগুলোও এ-পথের মিটমিট করে জ্বলে সেই নির্জনতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একে গ্যাসপোস্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে; তার ওপর কি কারণে জানি না, আলো তাদের এত ক্ষীণ যে, রাস্তায় আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে, এইটুকুও বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা যে আছে, কে তা জানতো! দু'পাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরী। কোনরকমে হাড়বেরনো ইট-কাঠের জীর্ণ দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোন বাড়িতে একটা আলো, না জন-মনিষ্যির একটা শব্দ। সে রাস্তার বাড়িগুলো সারের পর সার পোড়াবাড়ির মত খাঁ খাঁ করছে।

ক্রমশঃ মনে হলো, কেমন যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস যেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস সেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটার ভেতর ঠিক সেইরকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল, কিছুদূরে গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে;

কিন্তু জন-মানবহীন জীর্ণবাড়ীর সারের ভেতর ডাইনে কি বাঁয়ে—কোথাও কোন পথ নেই।

সামনের পথও খানিকদূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে-পথে ঢুকেছি, গলিটার ওই একটিমাত্রই তাহলে বেরোবার রাস্তা। আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল-পথ দেখালে কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসবাতিগুলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছিল, তারই কটা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হোলো, এ-গলি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই কস্মিন্ কালে, কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গাটা কেমন যেন ছম্ ছম্ করছিল।

সবে তো প্রথম রাত! কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখন লোকজনে, গাড়ি-ঘোড়ায়, মানুষের শব্দে গম্ গম্ করছে; অথচ এই পথটা কেমন করে এমন নির্জ্জন—নিস্তব্ধ হয়ে গেল!

মনে হোলো, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়েনি, কেউ যেন তা জানে না। আমি যেন প্রথম সে-শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গ্‌লাম।

খট্ খট্ খট্—আমার নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। সে শব্দ অদ্ভুতভাবে নির্জন অন্ধকারে বাড়ি গুলোর দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই রাস্তার কটা বাতি দপ দপ করে নিভে গেল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশঃ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হ'চ্ছিল। নাঃ এ-গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ ক'রে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিকদূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। এদিকেও যে গলির পথ বন্ধ ; কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে ? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি এ-বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। এ-গলি দিয়ে এগোবার সময়ে আশে-পাশে কোন পথই তো দেখতে পাইনি। তাহলে গলির দুমুখ বন্ধ হয় কেমন করে ?

ভাবলাম, হয়তো আরো একটা পথ ছিল। যাওয়ার সময় আমার দৃষ্টি কোনরকমে এড়িয়ে গেঝে, এখন আসবার সময়ে ভুল করে সেইটেতেই হয়তো ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ ; কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন করে ? আমি তো অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম না। আগাগোড়াই তো সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক একটা বাড়ীতেও যদি একটা আলো দেখা যেত, তাহলে না হয় ডেকেই জিজ্ঞেস করতাম।

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরুতে আমায় হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশঃ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তে কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা করে দিয়েছে।

এবারেও যখন দেখলাম, গলির মুখটা বন্ধ, তখন সত্যিই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক —ফাঁকা আকাশ, ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি ; শহরে এলে

একেবারে মেতে উঠলাম; যেমন করে হোক যেতেই হবে এই জাহাজে। জাহাজের ভাড়া দেওয়ার মত পয়সা নেই! অনেক কষ্টে জাহাজের হেড্‌খালাসীকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে, তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে তের্‌পল-ঢাকা ছোটো ছোটো বোট টাঙ্গানো থাকে। ঠিক হোলো, তারই একটার ভেতর আমি থাকবো। কেউ তাহলে টের পাবে না। হেড্‌খালাসী কোন এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমায় খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর-রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভেতরে গিয়ে হেড্‌-খালাসীর নির্দেশমত লুকিয়ে রইলাম। ভোর হওয়ার আগে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

তারপর কদিন কি অদ্ভুতভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি—তের্‌পল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি, আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর-রাতে যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে কজন ইঞ্জিনিয়ার ও ফায়ারম্যান এবং ওপরে হাল-ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া যখন আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিং ধরে দাঁড়াই।

এমনি করে কদিন বাদে যাভায় এসে পৌঁছোলাম। আগে ঠিক ছিল—সবাই নেমে গেলে কোন এক সময়ে হেড্‌খালাসী এসে আমার নামবার ব্যবস্থা করে দেবে; কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়বার আগের রাতে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে, তা হওয়ার উপায় নেই। এখানে মাল-নামানো হয়ে গেলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাইডকে রঙ্‌ করবার জন্যে পাঠানো হবে ঠিক হয়েছে। সুতরাং সেভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায়? হেড্‌খালাসী বললে যে, উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়বার সময় যে-যার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন যদি

আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি তাহলেই হয়। তাতেই রাজী হলাম।

জাহাজ জেটিতে লাগাবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাক্‌নি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠেই বাঁধা ছিল। রেলিঙ্গের ধারে গিয়ে জেটির উল্টোদিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ। কেউ দেখতেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাড্‌লের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল। কি ভীষণ তার টান! প্রাণপনেও আমি সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘুমন্ত ভয়ঙ্কর প্যাড্‌লের দিকে তলিয়ে গেলাম।

আমি শিউরে উঠে বললাম—তারপর?

'তারপর সেই প্যাড্‌লের ঘা। কি ভয়ঙ্কর লেগেছে দেখবি!'

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনও জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামাটা তুলে দেখালে।

একি। জামার নীচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা শূন্য।

ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই; ওধারের গ্যাসপোস্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম। সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য, শূন্য —সব শূন্য।

অস্ফুট চীৎকার করে সুটকেশ-হাতে আমি দৌড়োতে সুরু করলাম; কিন্তু কোথায় যাব? যেদিকে যাই নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চীৎকার করে একটা পোড়োবাড়ীর দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরের দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত সে আঘাতেয় প্রতিধ্বনিতে ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে উঠল; কিন্তু কারোর সাড়া নেই। অন্ধকার গলি—

অম্‌নিই আমাদের হাঁফ ধরে ; তার ওপর এই ভ্যাপ্‌সা-গন্ধভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক্‌ থেকে সে যেন জেলখানার মত আমাকে বন্দী করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাবো, তারও যো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যতই এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম, মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। স্যুটকেশটা বইয়ের ভারে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনি করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই তো বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল। দূরে একটা মিট্‌মিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না ! তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম—আরে ! এই তো আমাদের অবিনাশ। এতক্ষনের ভয়-ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চম্‌কে ফিরে তাকাল। বললাম—'কি আশ্চর্য ! তোর খোঁজ করতেই প্রায় একঘন্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে। বাব্বাঃ ! কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস্‌ তুই ! ঢুকে আর বেরোন যায় না।'

অবিনাশ একটু হেসে বললে—এসেছিস তাহলে ঠিক ?'

বললাম—এসেছি আর কই। তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ী কি খুঁজে বার করতে পারতাম !

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বললে—আমায় তাহলে তোর মনে আছে ভাই !

মনে থাকবে না কেন রে ?

'না ভাই, মনে থাকে না !···অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে, তার ভেতরেই আমরা বেঁচে থাকি !'

আমি হেসে বললাম 'ছিলি তো ভূপর্যটক, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে ? যাক, এখন তোর বাড়ি চল্ দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।'

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বললে—'আমার বাড়ি ! আচ্ছা চল্। আমার চিঠি পেয়েছিলি ?'

'হ্যাঁ, সে তো তিনমাস আগে।'

'তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'আবার ? তাহলে ফির্লি কবে ?'

অন্যমনস্কভাবে অবিনাশ বললে—'এই আজ।'

'এই আজ ? এবারে গেছিলি কোথায় ?'

'বল্ছি, চল্।'

সেই নির্জন গলি দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি; কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল—'এবারে ভাই, গেছিলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরোণো। নোনা-জল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ্-চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরোণো। চিম্‌নিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয়, বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন যেন একটা ভবঘুরে রুক্ষু রুক্ষু ভাব। সেইটেই তার সৌন্দর্য। তার ওপর যখন শুনলাম যে, এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাসে তার জঙ্গলের মশলা-গাছের গন্ধ ! তার ওপর গভীর বনের মাঝে তার বোরোবুদুর !

মাঝখানে মিটমিট করে যে একটি মাত্র তেলের আলো জ্বলছে, তাতে সামনের অন্ধকার একটু তরল হয়েছে মাত্র ; শেডের কোণে কোণে সে আলো একেবারেই পৌঁছোয়নি।

শেডটি শুধু যাত্রীদের অপেক্ষা করবার নয়, মাল রাখবারও জায়গা। একধারে টিনের চাল পর্যন্ত বড় বড় কিসের বস্তা স্তূপাকার করে সাজানো। আমি যেখানটায় ওজন করবার যন্ত্রটার ওপর বসে-ছিলাম সেখানে পরের পর সাজানো পিপের পাহাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আর একপাশে কেরোসিন কাঠের এক গাদা বাক্স ভালো ভাবে ঠাহর করে দেখলে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে বাইরের উজ্জ্বল বিদ্যুৎ চমকে সমস্ত শেড আলোকিত না হয়ে উঠলে অবশ্য এ সমস্ত আমি লক্ষ্য করতাম কিনা সন্দেহ! বিদ্যুতের আলো মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার সমস্ত শেড আরো অন্ধকার হয়ে উঠছে যেন! কেমন একটা অস্বস্তিকর অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, ঘোরালো অন্ধকারের জায়গাটা লাগছে রহস্যময়।

সখ ক'রে অবশ্য এ জায়গায় আসিনি। স্টেশনের কোনো ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেয়েই বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। সেকেণ্ড-ক্লাস ওয়েটিংরুমের সব কটা আসনই ভর্তি—ইণ্টার, ক্লাসের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে কে একজন যাত্রী হঠাৎ ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভয়ানক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা। মাত্র ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলেই গাড়ি পাওয়া যাবে জেনে শেষে এইখানেই আশ্রয় নিয়েছি।

কিন্তু শেডের তলায় আর কোন যাত্রী না দেখে প্রথমটা একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কি আজকাল আর ট্রেনে চাপে না! তবে রাত এখন অনেক, যাত্রী যা দু-একজন আছে, বৃষ্টি সত্বেও স্টেশনের প্লাটফর্মেই হয়তো কোনরমমে আস্রয় নিয়েছে, এমনও হতে পারে।

নির্জন শেডের ছমছমে অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, আমারও প্ল্যাটফর্মে কোনরকম একটা আশ্রয় খোঁজাই ভালো

ছিল। হাত-ঘড়িটার উজ্জ্বল ডায়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম সবে একটা বেজেছে। আরো এক ঘণ্টা এই শেডের তলায় কাটাতে হবে জেনে মনটা বিশেষ প্রসন্ন হয়ে উঠল না।

ভয়কাতুরে আমি মোটেই নই, এতবড় জংশন স্টেশনের যাত্রিনিবাসে বসে ভয় পাওয়ার কোন কথাও নয়, তবু আবছা অন্ধকারে চারিধারে স্তূপাকার মালের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে অস্বাভাবিক নির্জনতার জন্যেই বোধহয়, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

বাইরের সান্টিং প্রভৃতির শব্দ ও মেঘের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের এককোণ থেকে কেঠোপোকার কাঠ কুরে ফুটো করবার একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার একটা শব্দে চমকে উঠে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর বস্তাগুলোর ওপর থেকে দ্রুতবেগে নেমে অন্ধকারের কোণে চলে গেল। কিন্তু সে সব অস্বস্তির কারণ-হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

পোনেরো মিনিট আরো এইভাবে কেটে যাওয়ার পর কিন্তু সত্যিই অস্বস্তিটা যেন অত্যন্ত বেড়ে গেছে, মনে হোলো। বড় রেল-স্টেশনের শব্দের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, হঠাৎ মাঝে মাঝে সব একেবারে থেমে যায়, তারপর আবার শুরু হয় অতর্কিতে। এখন যেন শব্দের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেইরকম একটা ফাঁক পড়েছে, আকাশে মেঘের ডাক

মনে হোলো—আমার চারিধারে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

* * *

জ্ঞান যখন হোলো তখন দেখি, কে একজন আমায় বলছে—'উৎরিয়ে বাবু ইয়ে শিয়ালদা ইষ্টিশন হ্যায়।'

শেয়ালদা ষ্টেশন! অবাক্ হয়ে দেখি—আমি আমার স্যুটকেশ-সমেত একটা রিক্‌শয় বসে আছি। সামনে শেয়ালদা ষ্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম; কিন্তু কখন কেমন করে যে আমি রিক্‌শয় উঠেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি অবিনাশ ছ্মাস আগে যাভার বন্দরে অমনি করেই মারা গেছল।"

# হাতির দাঁতের কাজ

এ কাহিনীর যেমন খুশি মানে অবশ্য করা যেতে পারে। প্রতি দিনের সাধারণ বাস্তব-ঘটনার সীমা যেখানে শেষ হয়ে আজগুবির কিনারায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে এ-কাহিনীর জন্ম। নিজেদের মনের পাল্লা যেদিকে যেমন ঝুঁকবে, সেই হিসেবেই এ গল্পের রূপ বদলে যেতে পারে।

শুধু ঘটনাগুলো আমি তাই নিরপেক্ষভাবে এখানে বলে যাব।

ব্যাপারটার আরম্ভ যেভাবে হয়েছিল তা স্মরণ করলে এখনও আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি। সেই অন্ধকার বাদলার রাত! থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আকাশের অসহ্য গুমোট আর কাটতে চাইছে না। মোগলসরাই স্টেশনের থার্ডক্লাসের—ওয়েটিংরুম ঠিক নয়, টিনের চাল দেওয়া বিশাল শেডের তলায়—একেবারে একলা রাত দুটোর একটি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি, আর আকাশের মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারিধারে ইঞ্জিনের সান্টিং মালগাড়ীর পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা ও বিশাল জংশন স্টেশনের অসংখ্য অস্বাভাবিক অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছি। বিশাল টিনের শেডের

বললেন—"আর কে ছিল এখানে? চীনেম্যান, একজন চীনেম্যানকে দেখেছেন?

পেছনে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম—"ওইতো! কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! কোথায় সে চীনেম্যান!

দারোগাবাবু আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে কৌতুহল ভরে বললেন—"আপনার পেছনেই ছিল নাকি?

"এই তো কয়েক সেকেণ্ড আগেই দেখেছি। মুখের বাঁ দিকে একটা কাটার দাগ!"—আমার শুকনো গলা দিয়ে কথাগুলো যেন বেরুতেই চাইছে না।

পুলিশেরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছিল, দারোগাবাবু বললেন—"হ্যাঁ ঠিক দেখছেন; কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড আগে কি বলছেন? সে বেরিয়ে যায়নি এখান থেকে?"

"আমার জ্ঞানতঃ তো নয়!"

শেডের মধ্যে স্তূপাকার মালের পেছনে কোন জায়গায় চীনেম্যান লুকিয়ে থাকতে পারে মনে করে পুলিশ তারপর তন্নতন্ন করে খোঁজার আর কিছু বাকি রাখলে না, কিন্তু কোন চিহ্নই তার পাওয়া গেল না। কেমন করে যে সে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই এমন অন্তর্হিত হয়েছে, কে জানে!

হয়রান হয়ে পুলিশ শেষ পর্যন্ত খোঁজা বন্ধ করে শেড ছেড়ে চলে গেল। আগাগোড়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

পুলিশের লোক চলে যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হোলো, এ শেডের ভেতর একলা থাকা মোটেই আর নিরাপদ নয়। লোকটার কোন পরিচয় অবশ্য দারোগার কাছে পাইনি, কিন্তু মুখে অতবড় ক্ষত নিয়ে নেহাৎ কোন সাধুপুরুষ যে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না,

এটুকু বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া তার এই শেড থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ব্যাপারটার কোন ব্যাখ্যাই যে পাওয়া যায় না।

কথাটা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল একবার। না, আর এখানে একমুহূর্তও নয়। সুটকেশটা নীচে নামিয়ে রেখেছিলাম। সেটা তুলতে গিয়ে মেঝের ওপর কি একটা জিনিস পড়ে রয়েছে মনে হোলো। জিনিসটা তুলে আলোর নীচে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বেশ অবাক হলাম!

হাতীর দাঁতের খোদাই অপরূপ একটি ক্ষুদে মূর্তি! এসব জিনিসের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমার আছে, তাতেই বুঝলাম, কোন উঁচুদরের চীনে কারিকর ছাড়া এমন জিনিস কেউ গড়তে পারে না। মাত্র একবিঘৎ পরিমাণ মূর্তিটির সমস্ত অঙ্গ, মায় চোখের ভুরু পর্যন্ত অপরূপ কৌশলে খোদাই করা। হাতীর দাঁতে তৈরী সাধারণ চীনে-মূর্তির মত কাল্পনিক দৈত্য-দানবের রূপ এটিতে নেই। সাধারণ একজন চীনে মজুরশ্রেণীর লোক পিঠে ঝোলা বেঁধে একটু নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত শুধু সেই ক্ষুদে মূর্তির চোখের চাহনি, আর মুখের সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেখা-ফোটানো কায়দা।

মূর্তিটা যে চীনেম্যানেই তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি এখন করি কি? যেখানের জিনিস, সেইখানে রেখে যাব, না জমা দেব পুলিশের জিম্মায়!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোভই জয়ী হোলো। এমন অপরূপ শিল্প-কৌশলের নিদর্শন চুরি করতেও বুঝি সত্যিকার সমঝদারের বাধে না।

নেই, কেঠো-পোকাটাও যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়েছে। অসাধরণ একটা নিস্তব্ধতা।

সে নিস্তব্ধতা আমার পেছনদিকে খুব কাছাকাছি আচমকা একটা প্রচণ্ড ফোঁসফোঁসানির শব্দে ভেঙ্গে গেল। এটা যে নিকটের কোন লাইনে ইঞ্জিনের স্টীম ছাড়ার আওয়াজ তা বুঝেও চমকে ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না এবং সেই মুহূর্তে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বিচার করে দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার এমন কোন হেতুই অবশ্য ছিল না কিন্তু যে ঘরে এতক্ষণ নিজেকে একা বলে জেনে এসেছি সেখানে আচম্বিতে ঠিক নিজের পেছনেই অপরিচিত শাদা একটি মূর্তিকে বসে থাকতে দেখলে প্রথমটা একটু বিচলিত হয়ে ওঠাই অস্বাভাবিক বোধহয় নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে লোকটা আমার ঠিক পেছনে ওজন করবার যন্ত্রের ওপরে এসে বসলেও কখন যে সে ঢুকেছে, টেরও পাইনি। এখনও লোকটা ঠিক পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল, এতটুকু সাড়া-শব্দও নেই।

আবছা আলোয় অনেকক্ষণ ধ'রে লোকটাকে নজর করে দেখলাম। দুটো হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা নীচু করে সে বসে আছে, পাশে একটা ছোট বোঁচকা। পোশাক ও মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে তাকে সাধারণ দরিদ্র একজন চীনেম্যান বলেই সহজে বোঝা যায়।

বুঝে একটু বোকাই হলাম। এরকম নির্জন জায়গায় একজন সঙ্গী পেলে খুশী হওয়ারই কথা। দুটো আলাপ করে বাঁচা যায়, কিন্তু চীনেম্যানের সঙ্গে কি আলাপ করব? বাধ্য হয়ে তাই আবার মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। চীনেম্যানও আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার বলেই মনে হোলো। শেডের তলায় আর কেউ আছে বলে তার যেন খেয়ালই নেই।

মিনিট-পাঁচেক এইভাবে কাটবার পর আর একবার কৌতুহলভরে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছি এমন সময় বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

মাত্র এক সেকেণ্ডের সেই উজ্জ্বল আলোই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চীনেম্যান মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তার তেরছা আধবোঁজা চোখ তুলে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু আমি তখন যা দেখবার, তা দেখতে পেয়েছি। লোকটার গালের বাঁ-ধারে একটা লম্বা কাটার দাগ বাঁ-ভুরুর কোণ থেকে কানের ধার পর্যন্ত টাটকা ও জমাট রক্তে মিশে দগদগে হয়ে আছে।

হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে চমকে ওঠায় আমার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেছল কিন্তু চীনেম্যানের তাতে ভ্রূক্ষেপও দেখা গেল না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে আগেকার মত নিঃশব্দে নিশ্চল—নিস্পন্দভাবেই সে বসে রইল। মুখের অতবড় কাটাটাও যেন তার কাছে কিছুই নয়।

এবার রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলাম। এরকম অদ্ভুত সঙ্গীর সঙ্গে এই নির্জন জায়গায় বসে থাকবার মত মনের জোর তখন সত্যিই হারিয়েছি।

বাইরে বৃষ্টি আবার জোরে পড়তে শুরু করেছে তা সত্বেও উঠে প্লাটফর্মেই চলে যাব ঠিক করলাম। সঙ্গের ছোটো স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় বাইরে অনেক লোকের গোলমাল শোনা গেল। গোলমালটা এই দিকেই আসছে। দেখতে দেখতে কয়েকটা টর্চের আলো শেডের ভেতর এসে পড়ল তার পরেই কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ ও একজন কর্মচারীর আর্বিভাব।

টর্চের উজ্জ্বল আলো আমার দিকে ফেলে হিন্দুস্থানী দারোগা সাহেব একটু যেন বিস্মিতভাবেই এগিয়ে এলেন।

"আপনি—আপনি কতক্ষণ আছেন এখানে ?"

অবাক হয়ে বললাম—"তা প্রায় দেড়ঘণ্টা !"

"দেড়ঘন্টা ! আপনি কি একলাই আছেন ?"

"একলা ? না······"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই দারোগা সাহেব উৎসুকভাবে

ও স্যুটকেশ আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। না, সে মূর্তিটা ছাড়া আর সব জিনিসই ঠিক আছে।

ভদ্রলোক আমার মুখ দেখে সহানুভূতির স্বরে বললেন—"খুব দামী কিছু ছিল বুঝি! স্টেশন-মাষ্টারকে খবর দিন এক্ষুণি!'

তারপর একটু থেমে কি ভেবে বললেন—"ঠিক হয়েছে; ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামবার আগেই একজন চীনেম্যান এই গাড়িটা থেকেই নেমে গেল বলে মনে পড়ছে এবার!"

"চীনেম্যান!"

"হ্যাঁ পিঠে একটা বোঁচকা-সমেত। তখন অত খেয়াল করিনি। তারপর কামরায় ঢুকেই দেখলাম, আপনার স্যুটকেশের এই দশা! ঈস্! তখন যদি আমারই বুদ্ধি হত। যাই হোক পুলিশে খবর দিন এই বেলা স্টেশন-মাষ্টারকে বলে!"

কিন্তু আমি সিল্কের রুমালটা হাতে নিয়ে বিমূঢ় হয়ে বসেই রইলাম। রুমালটার একধারে সামান্য একটুখানি রক্তের দাগ।

# মাহুরি কুঠিতে এক দিন

ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাপারটা যতই ভেবে দেখছিলাম, ততই আরো অদ্ভুত লাগছিল। বাস্তব ঘটনা অবশ্য অনেক সময়েই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর হয় জানি, তবু যেন এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

দুদিন আগেই বিমলের সঙ্গে আমার মেসের ঘরে প্রায় একটা পর্যন্ত জেগে তুমুল তর্ক করেছি। শেষ পর্যন্ত এ-বয়সের তর্কাতর্কির যা পরিণাম হয় তাও আমাদের বচসায় হয়েছে। দুজনেরই জেদ ও রাগ বেড়ে গেছে এবং পরস্পরকে যা তা বলে যুক্তির অভাব পূরণ করেছি।

আমি বলেছি—"যেমন বুনোদের দেশে জঙ্গলের মাঝে থাকিস, তেমনি জংলী বুদ্ধিও হয়েছে।"

বিমল বলেছে—"শহরের মাঝখানে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় বসে বারফট্টাই মারতে সবাই পারে। একরাত ভেরেণ্ডির জঙ্গলের ধারে মাহুরি-কুঠিতে কাটাতে পারলে বুঝতাম।"

হেসে উঠে বলেছিলাম—"কাটাবার কি দরকার। তোর ভূত শহর

মূর্তিটা সুটকেশের ভেতর ভরে আমি শেড থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সে মূর্তি আমি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিনি। পথেই সে মূর্তি আমার হাত থেকে খোয়া গেছে। কেমনভাবে আমি তা হারালাম, সেই কথা এবার বলি।

রাত্তির দুটোর ট্রেন আধঘন্টা লেট করে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছোল, তখন বৃষ্টি মুশলধারে পড়তে আরম্ভ করেছে। সেই বৃষ্টির ভেতর ভালো কামরা খোঁজ করবার উৎসাহ আর ছিল না। সামনে যে কামরা পেলাম, তাইতেই উঠে কিন্তু খুশী হয়ে গেলাম। কামরাটি একেবারে খালি। একটা বাঙ্ক দখল করে শুয়ে পড়লে এর পরে যত লোকই উঠুক না কেন, বাকি রাতটা ঘুমের ব্যাঘাত আর হবে না।

ঘুমোবার আয়োজন করবার আগে কিন্তু আর একবার মূর্তিটা বের করে দেখার কৌতূহল জয় করতে পারলাম না। ট্রেনের জোরালো আলোয় তার কারুকার্য আরো ভালো করে দেখবার সুবিধে হবে বলে সুটকেশটা খুলে ফেললাম; কিন্তু কোথায় মূর্তি! সব জিনিসের ওপরে যে সেটিকে রেখেছিলাম, সে-কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। সুটকেশটি যেরকম জিনিসে ঠাসা, তাতে নাড়াচাড়ায় ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

তবুও সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যে ওপরের কাপড়-চোপড়গুলো এক-এক করে তুলে ফেললাম। দেখলাম, সে মূর্তিটা আছে ঠিক, কিন্তু এভাবে সিল্কের রুমালটায় জড়িয়ে সেটাকে রেখেছিলাম বলে কোন-মতেই স্মরণ করতে পারলাম না। অবশ্য তখন মাথার অবস্থা আমার খুব ভালো ছিল না। হয়তো বিমূঢ়তার মধ্যে এইভাবেই রেখে থাকব মনে করে সিল্কের রুমাল খুলে সেটা বের করলাম।

ট্রেনের জোরালো আলোয় তার অপূর্ব কারুকার্য সত্যিই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল; কিন্তু একটা খুঁত সেই সঙ্গে দেখতে পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেডের ম্লান আলোয় এ খুঁতটুকু ধরা পড়েনি।

চীনেম্যানের হাত থেকে অসাবধানে মেঝেয় পড়বার সময়ই বোধহয় মূর্তিটির মুখের বাঁ-ধারে একটু চিড় খেয়ে গেছে। সামান্য একটু সূক্ষ্ম দাগ মাত্র, কিন্তু এমন মূল্যবান জিনিসের এইটুকু খুঁত থাকলেও মন ক্ষুণ্ণ হয়।

সযত্নে মূর্তিটিকে আবার সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সুটকেশের ভেতর তুলে রাখলাম। তারপর সুটকেশটি মাথার কাছে রেখে পুলিশের ফেরারী আসামী সাধারণ একজন চীনেম্যানের হাতে এমন দামী জিনিস কেমন করে এসে পড়েছিল, ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

ঘুমের ভেতর অস্পষ্টভাবে সেই চীনেম্যানকেই যেন স্বপ্ন দেখ ছিলাম। আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় সে যেন কি বলে আমায় শাসাচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথাটা ধরে সজোরে সে ঝাঁকুনি দিলে। ঘুমটা সহসা ভেঙ্গে গেল।

সভয়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, চীনেম্যান নয়, একজন ভদ্রলোক আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাচ্ছেন।

বিমূঢ়ভাবে উঠে পড়লাম। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থেমেছে, বাইরে কুলি ও যাত্রীদের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের কথায় আমার কান গেল।

"কিরকম ঘুমোচ্ছেন মশাই! ট্রেনে এমন অসাবধানে ঘুমোয়?"

"কেন, কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না?"

দেখতে আমি সেই মুহূর্তেই পেলাম। আমার সুটকেশ খোলা, কাপড়-চোপড় জিনিস-পত্র তছনছ হয়ে কিছু বাঙ্কের ওপর, কিছু কামরার মেঝেয় পড়ে আছে!

"টাকাকড়ি ছিল নিশ্চয়, দেখুন কি গেছে!"

টাকাকড়ি নয়, কি যে গেছে, আমি সুটকেশের ওই অবস্থা দেখবা-মাত্র বুঝেছি। তবু দুরাশা ভরে সমস্ত কামরায় ছড়ানো জিনিসপত্র

আর ইলেকট্রিক লাইটকেই বা ডরায় কেন? বেছে যত পোড়ো-বাড়ি আর জঙ্গলে না থেকে সে-ই তো এখানেই এলেই পারে।"

বিমল চটে উঠে জবাব দিয়েছে—"তার দায় পড়েছে। ভূত আছে, একথা তোর কাছে প্রমান করার জন্যে তার তো মাথা ব্যাথা নেই।"

বিমলকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বলেছি—"তার না হোক, তোর তো আছে। তুই নিজে কোনোদিন মাহুরি না মুহুরি, কুঠিতে থেকে দেখেছিস!"

বিমল বলেছে—"রাত অবিশ্যি কখনও কাটাইনি তবে বাইরে-থেকে যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট।"

আমি এককথার উত্তরে এমনভাবে বিদ্রূপের স্বরে "ওঃ। বলেছি যে, বিমল মর্মাহত হয়ে চুপ করে গেছে।

খানিক বাদে গম্ভীরমুখে শুধু বলেছে—"সাহস থাকে তো একবার সেখানে যাস।"

আমি ব্যঙ্গ করে বলেছি—"গেলে অন্ততঃ মুহুরি-কুঠির বাইরে থাকব না।"

পরের দিন সকালে অবশ্য আমাদের এই তর্ক নিয়ে মনকষাকষির কোন চিহ্ন আর ছিল না। বিমল সকালের ট্রেনেই তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। অমি স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। আগের রাতের তর্কের কথা দুজনে ভুলেও একবার উত্থাপন করিনি।

কিন্তু কে জানতো, সে তর্কের জের অমন করে মেটবার নয়। দুদিন বাদেই আমাকে সত্যিসত্যিই ভেরেণ্ডির জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হবে, তাই বা কে ভেবেছিল।

বিমল চলে যাওয়ার পর একটা রাত পার হতেই দুপুরবেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। "বিমল মরণাপন্ন, এখুনি আমার দরকার।"—টেলিগ্রামের মর্ম এই।

যাওয়া যে দরকার, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যাওয়া সোজা নয়। ছোটনাগপুরের একটা নগণ্য স্টেশনে নেমে মাইল-দশ-

বারো গেলে ভেরেণ্ডির জঙ্গল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরোনো তামার খনিকে নতুন করে আবিস্কার করে আজ দু-বছর বিমল সেখানে কাজ করছে। সেই নির্বান্ধব পুরীতে যে সমস্ত কুলি মজুর নিয়ে সে দিন কাটায়, সাঙ্ঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা যে কোন সাহায্যই করতে পারবে না, এটা ভাল করেই বুঝতে পারছিলাম।

টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই বিকেলে রওনা হয়ে পড়েছি। ভেরেণ্ডির জঙ্গলে বিমলের নিমন্ত্রণ এভাবে রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে ভেবে সত্যিই অদ্ভুত লাগছিল। আর বিরক্তি লাগছিল যেতে এমন দেরি হওয়ায়। যে স্টেশনে নেমে ভেরেণ্ডির জঙ্গলে যেতে হয়, অত্যন্ত নিকৃষ্ট-ধরনের প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর সব গাড়ির কাছেই সে অস্পৃশ্য। তাই বাধ্য হয়ে প্যাসেঞ্জারেই চাপলেও তার শামুকের মত গতি ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে কি যে বিপদ সেখানে হচ্ছে কে জানে! বিমল অত্যন্ত শক্তধাতের ছেলে। সহজে সে কাতর কিছুতেই হয় না। সেই সুদূর জঙ্গলে একলা আজ সে দুবছর যেভাবে বাস করে আসছে, তা থেকে তার কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অত্যন্ত বিপদে না পড়লে সে যে আমায় তার করত না, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম গদাইলস্করি-চালের গাড়িতে আমি সেখানে পৌঁছোবই বা কখন আর তাকে সাহায্যই বা করব কি!

বিকেলবেলা যে গাড়ি রওনা হয়েছিল, সমস্ত রাত গুটি গুটি করে চলে ভোর প্রায় চারটার সময় টিনের চাল দেওয়া নিতান্ত আখখুটে চেহারার একটি স্টেশনে সে গাড়ি আমায় নামিয়ে দিলে। প্ল্যাটফর্ম বলতে কাঁকর-ফেলা খানিকটা জায়গা, ট্রেনের সব-কটা পা-দানি বেয়ে সেখানে নামতে হয়।

স্টেশন নয়, মনে হোলো যেন জনহীন কোন প্রান্তরে নেমেছি। শীতের রাত্রে ভোর চারটের সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তার ওপর গাঢ় কুয়াশায় স্টেশনের একটি মিটমিটে তেলের বাতি প্রায় অদৃশ্যই

হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানব কেউ আছে বলে মনে হোলো না। মিনিট-খানেক থেমে গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই তার নির্জনতা আরো যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। ট্রেনের আলোয় ও আওয়াজে নিজের নিঃসঙ্গতা এতক্ষণ এমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এ-স্টেশন থেকে বেরুতে তো হবে। ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তা এখান থেকে দশ-বারো মাইল-দূর, এইটুকু মাত্র জানি—কোন্ দিকে যে যেতে হবে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। জিজ্ঞাসাই বা করি কাকে! টিকিট চাইতেও তো কেউ আসে না!

স্টেশনের অস্পষ্ট বাতিটার দিকে এবার এগিয়ে গেলাম। স্টেশনের ঘরে কোন-না কোন লোক নিশ্চয়ই আছে।

"ঠারিয়ে!"

সত্যিই একেবারে আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানুষ নয়, যেন বাঘের গলার আওয়াজ! পিছন ফিরে কুয়াশায় ঘোলাটে একটা নীল আলো ছাড়া কিন্তু কিছুই প্রথমটা দেখতে পেলাম না। নীল আলোটা আরো একটু কাছে এগিয়ে আসার পর বিশাল একটা বস্তার মত জিনিস অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। জিনিসটা বস্তা নয়, মানুষের মাথা। প্রকাণ্ড কম্ফর্টার ও তার ওপর কম্বল জড়িয়ে অতবড় হয়েছে! সেই কম্বল ও কম্ফর্টারের সামান্য একটু ফাঁকের মধ্যে এবার প্রকাণ্ড এক-জোড়া গোঁফ ও দুটি জ্বল্‌জ্বলে চোখ দেখা গেল। শরীরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে অস্পষ্ট।

সত্যিই, প্রথমটা কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম। সেই কম্বল-জড়ানো মুখ থেকে গম্ভীর বাজখাঁই গলায়—"টিকস্' শুনেও যেন প্রথমে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারিনি।

আবার আওয়াজ এল—"টিকস্ কাঁহা?"

এবার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পকেট থেকে টিকিট বার করলাম এবং পরমূহূর্তে ভালুকের মত একটা মোটা লোমওয়ালা হাত হঠাৎ

অন্ধকার থেকে যেন বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলে মনে হোলো।

সাহস করে এবার জিজ্ঞাসা করলাম—"ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তাটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?"

নীল আলোটা দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে। সেটা থামল এবং কুয়াশার ভেতর থেকে শোনা গেল সবিস্ময় প্রশ্ন—"কাঁহা?"

"ভেরেণ্ডির জঙ্গল, যেখানে তামার খনি আছে!"

নীল আলোটা আমার কাছে সরে এল। কম্ফর্টার ও কম্বলের বস্তার তলা থেকে দুটি চোখ আমায় তীক্ষ্ণ-সবিস্ময়-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপারটা কি!

হঠাৎ "উধর মৎ যানা" শুনে চমকে উঠলাম এবং কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই বিমূঢ় হয়ে দেখলাম লোকটা চলে যাচ্ছে। পর মুহূর্তে নীল আলোটাই হঠাৎ বোধহয় নিভে গেল, অন্ধকারে অন্ততঃ আর কিছু দেখা গেল না।

কিন্তু আমার এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। স্টেশনের সেই আলোটি লক্ষ্য করে আবার এগিয়ে গেলাম। সেই আলোর কাছেই বাইরে বেরোবার গেটটা পেয়ে তবু আশ্বস্ত হওয়া গেল। পাশেই স্টেশনের একটিমাত্র ঘর। ভেতর থেকে টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা আওয়াজ আসছে। গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে কৌতূহল-ভরে একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সত্যি বিস্মিত হলাম। একটা কুলি বা চাপরাশিরও সেখানে দেখা নেই।

বাইরেও কুয়াশাছন্ন অন্ধকার শুধু একটা অস্পষ্ট পায়ের ধূসর যেঁায়াটে রেখা কোনরকমে চেনা যাচ্ছে। আপাততঃ আর কোন পথ না দেখতে পেয়ে সেইটিকে অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হোলো। খানিকবাদেই অন্ধকার কেটে গেলে আর ভাবনার কিছুই থাকবে না। তখন কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিজেই চলবে।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা কিছুই হোলো না। এরকম নির্জন পথ কোথাও আছে বলে জানতাম না। চারিধারে বিশাল ঘনজঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ দূরের কথা, এই ভোরের বেলা একটা পাখির আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না। সৌভাগ্যের কথা জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলার দু-একটা রেখা ছাড়া এ-পথ কোথাও দু-ভাগ হয়ে যায়নি।

ঘণ্টা-চারেক চলার পর পথ ক্রমশঃ ওপরে উঠেছে, বুঝতে পারলাম। জঙ্গলও সেখানে আরো নিবিড়। একটা চড়াই পার হয়েই দূরে একটা পাথুরে ঢিবির ধারে ছোটো একটা বস্তির মত দেখতে পাওয়া গেল। সে বস্তির পিছনে একটা বিশাল ভাঙ্গা পোড়ো-বাড়ি পাথুরে ঢিবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের ওপরে মাথা তুলেছে।

কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চিহ্ন পেয়ে বুঝলাম, সেইটেই খনি : কিন্তু এখানেও যে জন-মানব নেই! খোলার চালের ঘরগুলির অধিকাংশই সকালবেলাও বন্ধ। টালিতে ছাওয়া বাংলো-প্যাটার্নের একটি বাড়ি তার মধ্যে দেখতে পেয়ে সেইটেই বিমলের থাকবার জায়গা হবে মনে করে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় মৃদু একটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সামনেই বসবার ঘর, কয়েকটা বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল পাতা। পেছন-দিকে ভেতরের দিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে। এঘরেও কেউ নেই।

পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পেছনে পদ-শব্দ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। চমকে উঠবার কথা বটে। প্রায় ছফুট লম্বা অত্যন্ত রোগা ও সরু যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে, বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া অমন চেহারা কোথাও চোখে পড়েনি।

জিজ্ঞাসা করলাম—"বিমলবাবু কোথায় আছেন, বলতে পার?"

"কৌন্ বাবু?"

"বিমলবাবু। আমি তাঁর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি! কেমন আছেন এখন?"

"নিজ্জিনিয়ার বাবুকো মাঙ্গতা!" বলে লোকটা হাতের ও মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গি করলে।

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম—"নিজ্জিনিয়ার বাবুই হোলো, কিন্তু তিনি কোথায়?"

লোকটা আমার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে যা বললে, তার মর্ম বুঝতে আমার মিনিট-দুয়েক লাগল এবং তারপর স্তম্ভিত হয়ে আমি ঘরের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম।

ধীরে ধীরে তারপর সমস্ত ব্যাপারই শুনলাম। আমি টেলিগ্রাম পেয়ে যখন ট্রেনে রওনা হয়ে পড়েছি, তখন বিমল এ-জগৎ থেকেই রওনা হয়ে গেছে। সবচেয়ে আঘাত পেলাম যেভাবে সে মারা গিয়েছে, তার বিবরণ শুনে। এক হিসেবে আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারণ কোন অসুখে বিমল মারা যায়নি, তার মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক!

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বিমল এসে বোধহয় আমার বিদ্রূপ স্মরণ করেই জেদের বশে মাছরি কুঠিতে সমস্ত রাত একলা কাটায়। তার সঙ্গে যারা কাজ করে, তারা সকলেই মানা করেছিল, কিন্তু সে শোনেনি।

শেষরাত্রে অদ্ভুত একটা গোঙানি শুনে তার বেয়ারা রামদীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের মাঠে বিমলকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধরাধরি করে তাকে ভিতরে তুলে আনার পর দেখা যায়, তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন, গায়েও নানা জায়গায় দাগ আছে। সে নিজেই পড়ে যাক বা কেউ তাকে ফেলে দিয়ে থাকুক, কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ার দরুণ যে তার মাথায় দারুন চোট লেগেছে, একবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর সকালের দিকে আধঘণ্টাটাক তার জ্ঞান হয়েছিল, সেই সময়েই সে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলে; কিন্তু তারপর উন্নতির বদলে ক্রমশঃ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিকেল চারটার সময় সে মারা যায়।

এদেশের লোকের, বিশেষতঃ অশিক্ষিত কুলিমজুরদের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশি। তাদের ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে ভূতেই যে ফেলে দিয়েছে, এ-বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ নেই, সেই জন্যে বিমলের মৃত্যুর পর তার সৎকার করেই তারা সদলবলে খনির বস্তি থেকে চম্পট দেয়।

আমি সেইজন্যেই সকালে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পাইনি। বেচারা রামদীনও পালিয়েছিল। যাওয়ার সময় তবু বুদ্ধি করে সে স্টেশনে আমার ঠিকানায় আর একটা 'তার' করে দেয়। আগেই রওনা হওয়ার দরুন আমি সে 'তার' পাইনি। যে স্টেশনমাস্টার সে 'তার' নিজের হাতে পাঠিয়েছিল, তার অদ্ভুত আচরণের ও কথাবার্তার মানে এবার যেন একটু বোঝা গেল।
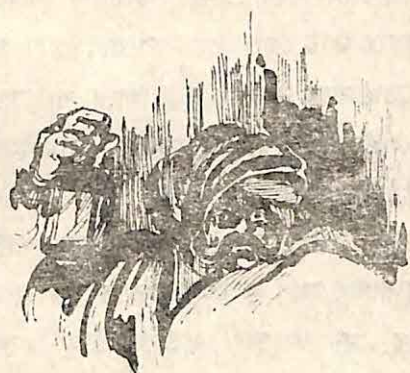
যার কাছে সমস্ত খবর পেলাম, ব্যঙ্গচিত্রের চেহারার মত চেহারার অদ্ভুত সেই লোকটিই রামদীন। আজ সকালবেলা সে সাহস করে বাবুর জিনিসপত্রের তদারক করতে কিংবা চুরির মতলবে, যে-কারণেই হোক 'নিজ্ঞিনিয়ার'বাবুর কুঠিতে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপার শোনবার পর আমার মনের অবস্থা যা হোলো তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিমলের এ-পরিণামের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি; কিন্তু এব্যাপারের পর চুপ করে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ভূতই হোক আর যাই হোক, এ-ব্যাপারের

রহস্যভেদ আমায় করতেই হবে। আমার সঙ্কল্প আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছি।

ভেরেণ্ডির জঙ্গল থেকে নিকটস্থ থানা প্রায় একবেলার পথ, দুপুরে রামদীনকে সেখানে খবর দিয়ে পাঠিয়ে আমি রাতের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্ততঃ বিমলের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যেই মাহুরি-কুঠিতে একরাত আমায় কাটাতেই হবে। তার জন্যে আয়োজন অবশ্য বেশি কিছু করবার নেই। শুধু একটা জোরালো বৈদ্যুতিক টর্চ ও একটা ছোটো লোহার রডই আমি সঙ্গে নেব, ঠিক করলাম।

সন্ধ্যের আগে রামদীনের ফিরে আসবার কথা, কিন্তু রাত প্রায় সাতটা হয়ে গেলেও তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। মুখে আমায় কথা দিলেও ভূতের ভয়ে সে শেষ পর্যন্ত সরে পড়েছে, বুঝতে পারলাম; কিন্তু পুলিশের লোকেরও দেখা নেই কেন? রামদীন কি থানায় খবরও তাহলে দেয়নি?

জঙ্গলের মাঝে পরিত্যক্ত খনির বস্তিতে আমি সম্পূর্ণ একা। রাত নটা বাজবার পর আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পুলিশের লোক আসুক বা না আসুক মাহুরি-কুঠিতে একাই আমায় যেতে হবে।

বিমলের বাংলো থেকে মাহুরি-কুঠি বেশিদূর নয়। দিনের বেলা বাড়িটিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রকাণ্ড দোতলা দু-মহলা কুঠি, কি খেয়ালে যে এখানে এত বড় বাড়ি কেউ নির্মাণ করেছিল, বোঝা কঠিন। বাড়িটির অবশ্য অত্যন্ত ভগ্নদশা। বড় বড় গাছ তার দেয়াল ভেদ করে বেড়ে উঠেছে; বাইরের দিকের ঘরগুলির জানালা-দরজার চিহ্ন আর নেই। এই শুকনো দেশেও ভেতরের ঘরগুলিতে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। ভাঙ্গা দেউড়ি দিয়ে বাইরের মহল পার হয়ে গেলে ভেতরের বিশাল মহলে

ওপর-নিচে অসংখ্য গোলকধাঁধার মত যে-সমস্ত ঘর পাওয়া যায়, দিনের বেলাতেও সেগুলি অন্ধকার! দরজা-জানালা অধিকাংশেরই নেই, যেগুলির আছে, সেগুলিও কব্জা থেকে খুলে পড়েছে। আসবাব-পত্র অনেক ঘরে এখনো অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিঁকে আছে, শুধু বোধ হয়, ভূতের ভয়ে চোরও সেখানে প্রবেশ করেনি বলে।

অমূলক ভয় আমার নেই, তবুও টর্চহাতে বাইরের দেউড়ি দিয়ে মাহুরি-কুঠিতে প্রবেশ করবার সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা যে ছমছম করে উঠেছিল, তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এমন গাঢ় জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় আমার সত্যি কখনও হয়নি। টর্চের আলোকে যেন সবলে তাকে কেটে বেরুতে হচ্ছে। বাইরের মহলের ওপর-নিচের সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। নিচের ঘরগুলোর দুর্দশা অত্যন্ত বেশি। আগাছায় মেঝে প্রায় ছেয়ে গেছে। ইট-সুরকী পাথর জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। ঘরগুলিতে ঢোকাও বিপজ্জনক। সে-সমস্ত ঘর ছেড়ে এবার ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার ঘরগুলি এখনো অনেকটা ভালো অবস্থায় আছে। একটার পর একটা টর্চের আলোয় ভালো করে পরীক্ষা করে যেতে যেতে কিন্তু অস্বাভাবিক কোন-কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিমলের মৃত্যুর রহস্য এ-বাড়ির সঙ্গে জড়িত না থাকলে অনায়াসে মনে করা যেত যে, নেহাত কুসংস্কারের দরুন এখানকার লোক এই পোড়োবাড়িটাকে এমন বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

বাড়িটির একটি বিশেষত্ব অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ঘরগুলি এমন বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো, যেখানে সেখানে, দরজা, ঘুলঘুলি প্রভৃতি এমনভাবে বসানো যে, সবশুদ্ধ একটা বিরাট গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে যেতে পথ গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশি।

সম্প্রতি সত্যিই তাই গুলিয়ে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছিল। খানেক আগে যে ঘর ছেড়ে গেছি, সেই ঘরেই আবার ঘুরে এসে সবিস্ময়ে

তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওপরে ওঠবার সিঁড়িটাও যে ঠিক কোন্‌দিকে হবে, বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠিক করে নিয়ে আবার এগুতে যাব, এমন সময় পায়ে যেন কি একটা ঠেকল। টর্চের আলো সেখানে ফেলে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিনিসটা আর কিছু নয়, একটা চামড়ার ব্যাগ ; কিন্তু এ-ব্যাগটির সঙ্গে আমি পরিচিত, কলকাতায় বিমলের কাছে আমি এটা দেখেছি এবং তার সুন্দর চামড়ার কাজের প্রশংসাও করেছি।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর একটি খোপে সূতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া করকরে নতুন দশটাকার নোট। আর একটি খোপে খুচরো কয়েকটি টাকা-পয়সা ও একটি ছোটো কাগজের টুকরা। এই কাগজের টুকরাটি দেখেই আমি চিনলাম—নিজের হাতে বিমলকে এই কাগজে আমার ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম।

বিমল তার মৃত্যুর আগের রাত্রে এই ঘরে যে ঢুকেছিল, এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু এ ব্যাগ তার পকেট থেকে পড়লই বা কি করে! আর কোন শত্রুর হাতে যদি তার প্রাণ গিয়ে থাকে, তাহলে তারা এ ব্যাগ ছোঁয়নিই বা কেন!

টর্চের আলোয় ঘরটা এবার আমি খুব ভালো করে তন্ন তন্ন করে দেখলাম। ঘরটি আকারে বেশ বড়, অন্যান্য ঘরের চেয়ে আসবাব-পত্রও একটু বেশি—দুটি ভাঙ্গা তক্তপোশ, একটা পা-ভাঙ্গা টেবিল। দেয়ালে লাগানো একটা কাঠের উইয়ে-খাওয়া বড় আলমারি ছাড়া খুচরো আরো অনেক জিনিস ঘরময় ছড়ানো, কিন্তু বিমলের আর কোন চিহ্ন সেখানে পেলাম না। এমন কি কাল সে যে এখানে ছিল, তার কোন পরিচয়ও নয়।

তবু এই ঘরেই রাতটা কাটাবার সঙ্কল্প আমি তখন করে ফেলেছি। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আমার করাই ছিল, পকেট থেকে মোমবাতি

বার করে ভাঙ্গা একটা তক্তপোশের ওপর রেখে জ্বেলে ফেললাম। টর্চের আলো তো সারারাত জ্বালা যায় না।

বাতিটা জ্বেলে তক্তপোশের ওপর বসতে গিয়ে কিন্তু উঠে পড়তে হোলো। পাশের ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় করে কি একটা ভারী জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ। এতক্ষণ এই পোড়োবাড়িতে এ-ধরনের কোন শব্দ কিন্তু শুনিনি।

টর্চটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কিন্তু প্রথমটা একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। হুড়মুড় করে পড়বার মত কোন জিনিস সেখানে নেই। অথচ আমি স্পষ্ট সে শব্দ শুনেছি। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আগের ঘরে ফিরলাম। বাতিটা কেমন করে ইতিমধ্যে নিভে গেছে, কে জানে! দেশলাই বার করে আবার সেটা জ্বালতে গিয়ে জ্বালা আর হোলো না।

বাইরের বারান্দায় চটি পায়ে দিয়ে ফট্‌ফট্‌ করে চলার স্পষ্ট শব্দ। ঝড়ের মত এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ ফেলবার আগেই কিন্তু শব্দটা গেছে থেমে। টর্চ ফেলে অবাক হয়ে দেখলাম সত্যিই ছুটো মান্ধাতার আমলের শুকনো চিমড়ে ছেঁড়া বেহারী-চটি সেখানে পড়ে রয়েছে।

না, ভয় তখনও আমি পাইনি বরং কোন দুষ্টলোকের কারসাজি যে এর ভেতর আছে, সেই সন্দেহই আমার তখন দৃঢ় হয়েছে। সে কারসাজির সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

চটি-ছুটো হাতে করে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম এবং বাতি জ্বেলে গ্যাঁট হয়ে ভাঙ্গা তক্তপোশের ওপর বসলাম ঘটনার পরিণতি দেখবার জন্যে। ভূতুড়ে চটি যদি হয়, তো আমার চোখের সামনেই চলুক দেখি! মিনিট দশেক কোনকিছুই হোলো না। ভুতুড়ে চটির ক্ষমতার বহর দেখে নিজের মনেই হাসছি, এমন সময় সত্যিই—সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

চুপি চুপি আমার পেছনে কে যেন স্পষ্ট আমার নাম ধরে ডাকলে একবার!

মোমের বাতিতে ঘরে তেমন আলো না হলেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেছনে কেউ কোত্থাও নেই। তবে এ শব্দ এল কোথা থেকে!

আমার মনের ভুল! কিন্তু মনের এরকম ভুল হওয়াও তো ভালো লক্ষণ নয়! ভয় পেয়ে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় তারাই চোখে নানারকম ভুল দেখে, কানে নানারকম আওয়াজ শোনে বলেই তো জানি।

নাঃ, আরও সতর্ক এবং সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবার। নিজের মনের ভুলে ভয় পাওয়ার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এতক্ষণ শুধু ঘরগুলো ঘোরাফেরা করতেই কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। শীতকালের ভোর হতে এখনও প্রায় ছ'ঘণ্টা বাকি। এই ছয় ঘণ্টায় শুধু ঘুমে চোখ না জড়িয়ে আসে এইটুকু দেখতে হবে! বসে থাকলে পাছে ঘুম আসে বলে এবার ঘরে পায়চারি করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য! আমার প্রত্যেক পা ফেলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যেন আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে যদি কারুর পায়ের শব্দ হয়, তাহলে তার চেহারাখানা যে কিরকম, তা কল্পনা করাও কঠিন! বারান্দায় একটা হাতী হাঁটলেও বোধহয় অমন শব্দ হত না।

পায়চারী করতে করতে ইচ্ছে করে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দও গেল থেমে। আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে শব্দ শোনা গেল।

এবার বাইরে ব্যাপরটা দেখতে যেতেই হোলো। টর্চ নিয়ে সমস্ত পথটা কিন্তু তন্ন তন্ন করে বৃথাই খুঁজে দেখলাম।

ফিরে এসে দেখি, আবার আলো গেছে নিভে। নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমশঃই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশলাইটা বার করেছি এমন সময়—

"আলো জ্বেলো না ভূপেন !"

মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে একটা যেন বরফ-গলানো জলের স্রোত নেমে গিয়ে সমস্ত শরীর অবশ করে দিলে। এ যে স্পষ্ট বিমলের গলা !

খানিকক্ষণ শুকনো গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না, তারপর জড়িতস্বরে কোনরকমে বললাম—"কে তুমি ?"

"আমি—আমি বিমল ! দোহাই তোমার, আলো জ্বেলো না।"

"কেন ?"

"তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই, তাও বলতে পারব না। তুমি ভয় পেয়েছ ভূপেন ?"

ধরা-গলায় ঢোক গিয়ে বললাম—"না।"

"তাহলে টর্চ না জ্বেলে এগিয়ে এসে তক্তপোশটায় বস।"

আমি হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোশটায় এসে বসলাম।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল—"তুমি আসাতে কি খুশী যে হয়েছি, বলতে পারি না !"

কথাটা শুনে নিজে যথেষ্ট খুশী না হলেও বললাম—"তাই নাকি !"

"হ্যাঁ, তুমি না এলে আমায় এইখানে কতকাল বন্দী হয়ে থাকতে হত, কে জানে !"

"কেন ?"

"দুটো দরকারী কথা না বলে আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলাম না।"

"পৃথিবী ছেড়ে কোথায় ?

খানিকক্ষণ কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়, বললে না ?"

"সে-কথা জানতে চেয়ো না, তোমাদের জানবার অধিকার নেই?"

"ও, কিন্তু তুমি কি বরাবর এখানে আছ?"

"বরাবর। যতক্ষণ তুমি এসেছ, তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন একটু তোমার পাশে বসব?"

তাড়াতাড়ি বললাম—"না-না, কি দরকার! কিন্তু ওসব শব্দ-টব্দ কি তুমি করছিলে?"

"আমি! না-না, আমি নয়, ওরা-সব করেছে!"

সভয়ে—সবিস্ময়ে বললাম—"ওরা!"

"হ্যাঁ, ওরাও আছে, ওরা ওইরকম করতে ভালবাসে, আমার কিন্তু ভাল লাগে না। তবে—"

"থামলে কেন? কি তবে?"

"তবে অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে হলে বিরক্তি আসে, তখন ওই-সব বদখেয়াল হয়।"

"ওরা কি অনেকদিন আছে?"

"অনেকদিন! যোধমল তো মানসিংহের সঙ্গে মনসবদার হয়ে এসেছিল, আর দেবদত্ত অশোকের সময়ের!"

"এতদিন ওরা কেন এখানে আছে?"

"কি করবে, মায়ার বন্ধন! যোধমল এখানকার এক রাজকোষ লুঠ করবার সময় দামী একটা মোতির মালা পেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। সেই লুকোন জায়গার কথা কাউকে জানাবার আগেই তলোয়ারের খোঁচায় মারা যায় বলে বেচারার আজও মুক্তি হোলো না।"

একটু উৎসুকভাবে বললাম—"কাউকে জানালেই তো পারে।"

"উঁহু, যাকে-তাকে জানালে হবে না, ওর বংশধর, আত্মীয়স্বজন, অন্ততঃ দেশের লোক না হলে জানাবার উপায় নেই।"

"অর্থাৎ মাড়োয়ারী চাই?"

"হুঁ—মাড়োয়ারীরা আবার এধার মাড়ায় না।"

যোধমল-সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে বললাম—"আর দেবদত্ত?"

"দেবদত্ত? দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে দেখি!"

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ; তারপর শোনা গেল—"দেবদত্তের উদ্ধার হওয়া আরো শক্ত।"

"কেন?"

"অশোকের সময় ও মঞ্জুশ্রী না ধ্যানশ্রীর কি একটা মূর্তি গড়েছিল।"

"সেটা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি বুঝি? কোথায় সেটা? "আমি না হয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে……"

"না-না, আবিষ্কৃত হয়েছে বই কি! কিন্তু পণ্ডিতরা তর্কাতর্কি করে তার নাম নিয়ে বাধালে গোল, কেউ বলছে—সেটা মূর্তিই নয়, কেউ বলছে— কি বলে—প্রজ্ঞা পারমিতা!"

"তাতে কি!"

"চুপ চুপ। দেবদত্ত একেবারে ক্ষেপে উঠবে এক্ষুনি! তাতেই তো সব! নাম ঠিক হওয়া না দেখে ও কিছুতেই যেতে পারছে না এখান থেকে!"

"আমি না এলে তুমিও যেতে পারতে না?"

"বোধ হয় না।"

"ওই সব বদখেয়াল?"

"তাও হয়তো! এক্ষুণি তো মাঝে মাঝে কিরকম নিশপিশ করে…"

"কি নিশপিশ করে? হাত!"

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল—"হাত তাকে বলে না! তবে…"

গলার স্বরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বললাম—"যাক্‌গে ভাই, তোমার কি কথা ছিল না, যা বললেই তোমার ছুটি?"

"হ্যাঁ ছুটি, একেবারে ছুটি!"

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"বলা হলেই তুমি চলে যাবে?"

"তৎক্ষণাৎ!"

"কিন্তু তুমি চলে গেলে এই—যোধমল আর দেবদত্ত—"

"না-না, তোমার কোন অনিষ্ট করবে না এরা, আমার বারণ আছে!"

"তবে বল এবার !"

"এই বলছি—কুঁক্ !"

"ও আবার কি ?"

"ও কিছু না !"

"কিন্তু হেঁচ্‌কির মত শোনাল যেন।"

"পাগল! হেঁচ্‌কি কোথায়—কুঁক্।"

"কিন্তু আমরা তো ওকেই হেঁচ্‌কি বলি।"

আমরা বলি না!"

"তবে কি ওটা ?"

"ও আমাদের ভৌতিক দেহের বুংকার।"

"বুংকার কি ?"

"ও-কথার মানে তোমরা বুঝবে না। ওটা এ-জগতের কথা !"

"ও-জগতের কথা আলাদা না কি। এতক্ষণ তো বেশ বাংলা বলছিলে।"

"অনেক কষ্টে অনুবাদ করে বলতে হচ্ছিল, কিন্তু বুংকারের অনুবাদ হয় না···কুঁক্।"

"না ভাই এটা হেঁচ্‌কি।"

"উঁহুঁ, বুংকার।"

"আমি তাহলে আলোটা জ্বালছি !"

"দোহাই তোমার! এখনো আমার কথা বলা হয়নি···কুঁক্।"

"কথা তুমি পরে ব'লোখন। এখন একটু জলের চেষ্টা দেখি।"

"আমাদের জল লাগে না, আলো জ্বাললেই আমায় চলে যেতে হবে···কুঁক্।"

"তা না হয় খানিক চলে গিয়ে তোমার 'বুংকারটা' থামিয়ে এসো।" বলে সত্যিই দেশলাই বের করে মোমবাতিটা জেলে ফেললাম।

কিন্তু একি! ঘরে যে কেউ নেই! একি ব্যাপার!

"কুঁক্!"

"বিমল তুমি আছ এখানে?"

বিমলের কোন উত্তরের বদলে শোনা গেল—"কুঁক্।"

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার মনে আর কোন সংশয় রইল না। এগিয়ে কড়া দুটো ধরে সজোরে কাঠের আলমারির পাল্লা দুটো আমি খুলে ফেললাম।

—"একি। বিমল তুমি! সশরীরে?"

বিমলের গলা থেকে বেরুল—"কুঁক্!

ব্যাপারটা এতক্ষণ বোধ হয়, অনেকখানিই বোঝা গেছে। হেঁচ্‌কিটুকু উঠে সব না খেচড়ে দিলে বিমলের ফন্দিকে সার্থক বলা চলত। তার টেলিগ্রামে আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং আগের দিন মাইল-দশেক দূরের এক মস্ত মেলার জন্যে খনির লোকজনকে ছুটি দেওয়ায় তার অন্যদিকে সুবিধে হয়ে গেছল। শুধু রামদীনকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকে টানতে হয়েছিল। পোড়োবাড়িতে তার দুর্‌মুষ ফেলা ও পেটানোর আওয়াজের যে নমুনা সে দেখিয়েছে, তাতে তারিফ তাকে অবশ্যই করতে হয়। অবশ্য স্টেশন-মাস্টারের অদ্ভুত মূর্তি ও আচরণ বিমলের ফন্দিকে সাহায্য করবে, একথা সেও ভাবেনি।

# মাঝরাতের কল

যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৃথিবীকে জানি, তাদের ত্রুটি অনেক। অনেক রকম ভুল তাদের হয়। তবু আমাদের মত সাধারণ মানুষের তাদের ওপর বিশ্বাস অগাধ। অগাধ বিশ্বাস আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর। এই কটা ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে না এলেই—আমরা অনায়াসে অনেক কিছুকে উড়িয়ে দিই। বুদ্ধি দিয়ে আমরা কঠিনভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে সব কিছুর ওপর রায় দিই কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যা সত্য মিথ্যার মাঝামাঝি জগতের—যেখানে বুদ্ধি থই পায় না, ইন্দ্রিয় হার মেনে যায়।

সেইরকম একটা কাহিনীই আজ বলতে বসেছি।

গোড়ায় নিজের একটু পরিচয় দেওয়া ভাল। পশ্চিমের কোন একটি মাঝারি গোছের সমৃদ্ধ শহরে আমি ডাক্তারি করি। শহরের নামের কোন প্রয়োজন এ-গল্পে নেই সুতরাং নামটা না-ই করলাম!

সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহুদূরের একটা 'কল' সেরে একলাই ফিরছিলাম। একে দারুণ শীত এ-বছর তার ওপর রাত অনেক হওয়ায় ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশী পড়েছিল। পুরু পুরু গোটাকতক গরমের জামা থাকা সত্ত্বেও সব ভেদ করে মনে হচ্ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পাঁজরার ভেতর গিয়ে ঢুকছে!

আসছিলাম আমার পুরনো মোটরে। এ-মোটর আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল সঙ্গে একজন সোফার থাকলেই বুঝি ভাল হত। এই দারুণ শীতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।

আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ান। বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় করে চারিধারে অনেকদূর পর্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে; কিন্তু জমাট বাঁধেনি। অনেক সময় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জন রাস্তা ছাড়া আর কোনো যোগ নেই।

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটিও অত্যন্ত নির্জন। দুধারে মাঝে মাঝে হরতুকী বা মহুয়া গাছ। আর রাস্তার দুধারে শুধু শূন্য অসমতল মাঠ। তার ভেতর বাড়ি-ঘর নেই বললেই হয়। কে বাড়ি করবে এই নির্জন জায়গায়।

অন্ধকারে অবশ্য এসব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার মোটরের মিটমিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল অন্ধকারের সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কোনরকমে কেটে চলেছি।

শীতের দরুণ কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্তমনেই চলেছিলাম। আমার কারটি পুরনো হলেও মজবুত। বেয়াড়াপনা সে করে না। আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের মধ্যে আরাম করে যে শুতে পাব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুতগতিতে। নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে ভেতরে বসে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার আরামের কথাই ভাবছি। ডাক্তারদের মত পরাধীন আর কেউ নয়। তবু মনে হচ্ছিল একবার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে প্রাণের দায়ে ছাড়া শুধু পয়সার জন্য আর আমায় কেউ বের করতে পারবে না। এখন কোনরকমে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখস্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেল। আমার একান্ত সুস্থ-সবল মোটর থেকে থেকে কেন অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। মোটরের এরকম আচরণের কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। আজ দুপুরেই আমার মোটরের ভালোরকম সেবা শুশ্রূষা হয়ে গেছে। কোনরকম রোগের আভাস তার ভেতর তখন ছিল না। হঠাৎ তার এরকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কি?

এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জন এই পথের মাঝে মোটরের এই বেয়াড়াপনায় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। এখনও প্রায় সাত-আট মাইল পথ বাকী। রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কি? এই রাত্রের ডাকেও সঙ্গে লোক না আনার নির্বুদ্ধিতার জন্যে এবার নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল। সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে মোটরের আর্তনাদ আরো বেড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। মোটর-চালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু করতে পারলাম না। কাতরাতে কাতরাতে খানিক দূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে এক জায়গায় একেবারে থেমে গেল। আর তার নড়বার নাম নেই। চেষ্টার আমি তখনও ত্রুটি করলাম না; কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুটভাবে একটু কাতরোক্তি করে ওটা ছাড়া আর কোন সাড়া সে দিল না।

ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যিই তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মোটর ফেলে এই দারুন শীতের মাঝে সাত-আট মাইল জনহীন পথ হেঁটে যাওয়ার কথা তো কল্পনা করা যায় না। এই মাঠের মাঝে মোটরে সারারাত কাটানও অসম্ভব। এখন উপায়।

"ডাক্তারবাবু!"

হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই জনশূন্য পথে এমন সময়ে কে ডাকলে?

আবার শুনতে পেলাম—"ডাক্তারবাবু।"

এদিক-ওদিক অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবার দেখতেও পেলাম। পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের পাশে আবছা একটি দীর্ঘ শীর্ণমূর্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন জায়গায় কেমন করে তার উদয় হলো, বুঝতে না পারলেও সাড়া দিয়ে বললাম—"কে তুমি?" মনে তখন আমার একটু আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। তার আবির্ভাব যেমনই বিস্ময়কর হোক না কেন লোকটার কাছে সাহায্য পাওয়ার সম্ভবনা তো আছে।

লোকটা সেই জায়গা থেকেই বললে—"আমায় চিনবেন না আপনি।"

চেনবার জন্যে আমি তখন ব্যস্ত নই। আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক তখন দরকার মাত্র। সেই কথাই আমি তাকে বলতে যাচ্ছি এমন সময় লোকটা আবার বললে—"আপনাকে একটু আসতে হবে ডাক্তারবাবু! ভারী অসুখ একজনের।"

এমন সময়ে এ অনুরোধে বিরক্ত যেমন হলাম, আশ্চর্যও হলাম তেমনি। ঠিক এই সময়ে রাস্তার ঠিক এই জায়গায় রোগী কি আমার জন্যে তৈরী হয়ে বসেছিল!

লোকটা আমার মনের কথাই যেন আঁচ করে বললে—"এ ভগবানের দয়া ডাক্তারবাবু। এমন সময় আপনাকে এখানে পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি, অথচ না পেলে কি বিপদই যে হত।"

বেশী কথাবার্তা তখন আর ভাল লাগছিল না। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—"কোথায় তোমার রোগী?"

লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর একদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করলে। সেদিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যি দূরে একটা বাড়ির আলো যেন দেখা যাচ্ছে। এরকম নির্জন প্রান্তরের মাঝে এরকম বাড়ি খুব কমই থাকে। হঠাৎ এরকম জায়গায় এমন সময়ে যাওয়াও একটু বিপজ্জনক। তবে শত্রু আমার কেউ তো নেই এবং সঙ্গে টাকাকড়িও নিতান্ত সামান্য, এই যা ভরসা।

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি অসুখ?"

উত্তর এল—"জানি না ডাক্তারবাবু কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থা, তাড়াতাড়ি না গেলে বোধহয় বাঁচানো যাবে না। দোহাই আপনার, চলুন ডাক্তারবাবু।"

কোথায় নিজের বিপদ সামলাব, না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝরাতে যেতে হবে পরের চিকিৎসায়। তবু ডাক্তার মানুষ—জীবন-মরনের সমস্যা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই বললাম—"চল।"

মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটা পথ। অন্ধকারে ভাল দেখাই যায় না। তাই ধরে লোকটার পিছু পিছু মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সেইদিক দেখিয়ে লোকটা বললে—"এই ঘরেই রোগী বাবু, আপনি যান, আমি এখুনি আসছি।

অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম, বাড়িটি বিশেষ সমৃদ্ধ-চেহারার নয়। গুটি-চার-পাঁচেক ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠোন। ঘরগুলিও সব পাকা-ছাদের নয়, দু পাশে খোলার ছাউনি।

লোকটার কথামত সামনের ঘরে গিয়ে এবার ঢুকলাম। ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর নানান আকারের বাক্স পেঁটরায় বোঝাই বলে ভেতরে নড়বার চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প। দরজার মুখোমুখি একটি জানালা। সেই জানালার ধারে মিটমিট করে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল' দরজার বাঁ-ধারে একটি চারপায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন—"এসেছেন ডাক্তার-বাবু। আপনার দয়া কখনও ভুলব না, বসুন।"

ঘরের ভেতর এদিক-ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটিই মাত্র দেখতে পেলাম। জানালার কাছে চারপায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া। সেইটেই টেনে চারপায়ার কাছে বসবার উদ্যোগ করতে ভদ্রলোক আবার ক্ষীণস্বরে বললেন—"বসুন, বসুন, ওইখানেই বসুন, আগে আমার রোগের কথা বলি, শুনুন।"

একটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম। রোগীদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বুঝলাম খানিকক্ষণ ধরে নিজের রোগ-সম্বন্ধে ভদ্রলোকের নানা মতামত এখন আমায় শুনতে হবে। না শুনলে নিস্তার নেই।

ক্ষীণস্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন—"আমার রোগ কি সারাতে পারবেন ডাক্তারবাবু? পারবেন আমাকে বাঁচাতে?"

একটু হেসে বললাম—"সেই চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ। আর বাঁচবেন না-ই বা কেন?"

একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এল খাট থেকে—"বাচতেও পারি তাহলে ডাক্তরবাবু! কেমন।"

বললম—"পারেন বই কি! কি তেমন আর হয়েছে আপনার?"

"না, তেমন আর কি হয়েছে।" ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন,

তারপর বললেন—'ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা, কেমন না? কিন্তু ধরুন, তাতেও যদি না বাঁচি, যদি আজ রাত্রেই মারা যাই?"

রোগীর এই অর্দ্ধোন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে কি যে বলব, কিছুই ভেবে পেলাম না। মনে মনে তখন এই বিলম্বের জন্য অস্থির হয়ে উঠছি।

রোগীই আবার বললেন—"যদি আপনি থাকতে থাকতেই মারা যাই ডাক্তারবাবু, কি হবে তাহলে? কে আপনার 'ফী' দেবে?"

আচ্ছা পাগল রোগীর পাল্লায় তো পড়া গেছে। বললাম—"যদি নেহাতই তাই হয়, তাহলে 'ফী' না হয় নাই পেলাম। আমরা শুধু ফী-র জন্যেই সব সময়ে আসি না!"

"তা বটে, তা বটে। পৃথিবীতে ভালো লোক, পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব তাহলে এখনও আছে, না ডাক্তারবাবু? কিন্তু ফী-র ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি ডাক্তারবাবু। হঠাৎ যদি মরে যাই, তাহলে ওই বাক্সটি খুলে ফেলবেন, বুঝেছেন ডাক্তারবাবু—ওই বেতের ছোট্টো বাক্সটি।"

ভদ্রলোকের স্বর আরো মৃদু হয়ে এল—"ওই বাক্স থেকে আপনার প্রাপ্য টাকা নেবেন। আরও একটা জিনিস নেবেন ডাক্তারবাবু। বলুন, নেবেন তো?"

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—"কি?"

"কিছু না, ডাক্তারবাবু, একটা কাগজ! কিন্তু ভয়ানক দরকারী কাগজ! এ-কাগজে যে ওখানে আছে, শুধু আমি জানি আর আপনি এখন জানলেন। আর কেউ জানে না। জানলে আর ওখানে ওটা থাকতো না।"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে আবার বললেন —"এ" বাড়ীতে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাববেন না যেন, আমার কেউ নেই! আমার অনেক আত্মীয় আছে—ওত পেতে আছে আমার মরার অপেক্ষায়। শুধু তাদের বিশ্বাস, আজ আমি হয়তো মরব না। তাদের বিশ্বাস মরবার আগে আর আমি কিছু করব না। তারাই পাবে সব।"

"আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম—'আপনার অসুখটা সম্বন্ধে—"

"হ্যাঁ, অসুখ তো দেখবেনই, তার আগে আর একটা কথা বলে নিই—ওই কাগজটি আমার উইল, ডাক্তারবাবু। আমার ছেলের নামে উইল। সে ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম একদিন, কোথায় আছে, তাও জানি না ; কিন্তু জানেনই তো রক্ত জলের চেয়ে ঘন।"

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বললাম—"এইবার আমি দেখতে পারি ?"

খাট থেকে আওয়াজ এলো—"দেখুন।"

আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রোগীর নাড়ি দেখবার জন্যে হাতটা তুলে ধরলাম এবং পরমুহূর্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতরও আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল।

সে হাত বরফের মত ঠাণ্ডা ! রোগী মৃত। শুধু মৃত হলে এতখানি আতঙ্কের আমার বোধহয় কারণ থাকতো না। কিন্তু ব্যাপার যে আলাদা। ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে এ-রোগী এই মাত্র কখনই মারা যায়নি। তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে কয়েক ঘণ্টা আগে। সমস্ত দেহ তার কঠিন।

উন্মাদের মত আরো খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। নাঃ, ভুল আমার হতেই পারে না। কিন্তু তাহলে এ-ব্যাপারের অর্থ কি ?

তখন কিন্তু স্থিরভাবে কোন চিন্তা করবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে আমার বুকের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থেমে আসছে। হঠাৎ জানালার কাছে বাতিটা দপ্ দপ্ করে নেচে উঠল। সেটা একবার নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল একফোঁটাও নেই। প্রান্তরের মাঝে নিস্তব্ধ নির্জন বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমি একা এই বাতির আলোটুকুই যেন আমার একমাত্র সহায় ছিল তাও নিভতে চলেছে দেখে আমি দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, পিছনে আলোটা আর কয়েকবার নেচে নিভে গেল। তখন আমি উঠোন ছাড়িয়ে এসেছি প্রায়।

কিভাবে তারপর অন্ধকার প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে

মোটরে উঠেছিলাম, তা আমার মনে নেই। মোটর চালিয়ে শহরের মাঝ বরাবর আসবার পর আমার যেন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হলো মোটরের এই চলা। খানিক আগে অদ্ভুতভাবে যে মোটর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ এবার বিনা চেষ্টায় আপনা হতে সে মোটর এমন শুধরে গেল কি করে?

*　　　*　　　*

তার পরদিন দিনের আলোয় লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে সেই প্রান্তরের মাঝেকার বাড়ির নিঃসঙ্গ রোগীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর ছেলেই আজকাল সমস্ত বিষয়ের মালিক।

সেদিনকার রহস্যের স্বাভাবিক মীমাংসা কিন্তু আমি এখনও করতে পারিনি।

# কঙ্কাল কর্কট
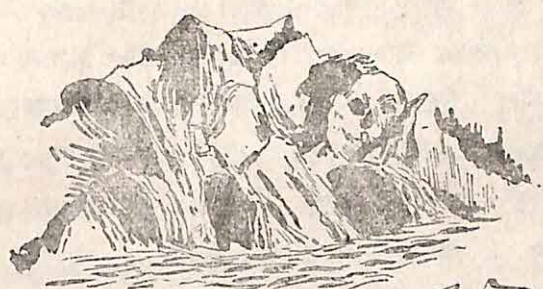
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কম্বোজের পূর্ব উপকূলে একটি অসাধারণ রহস্যময় ব্যপার ঘটে।

কম্বোজের পুরাণো সরকারী দপ্তরে তার উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো বিস্তৃত বিবরণ নেই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে কম্বোজের পূর্ব উপকূলে ভয়ানক জলদস্যুর উৎপাত আরম্ভ হয়। কম্বোজের জল পুলিশ, নৌ-সেনা প্রাণপণ চেষ্টা করে তাদের দমন করতে পারে না। দমন করা দূরে থাক—তাদের সন্ধান পর্যন্ত পায় না।

কোথা থেকে সিন্ধু-শকুনের মত এই জলদস্যুদের বেগবান স্লুপগুলি এসে বড় বড় বাণিজ্য-তরীর ধনসম্পদ যে লুটে নিয়ে যেত, কম্বোজের যুদ্ধতরীগুলি কিছুই বুঝে উঠতে পারতো না। কম্বোজের সমস্ত কড়া পাহারা এড়িয়ে রাজকর্মচারীদের চোখে ধূলি দিয়ে এই জলদস্যুর দল এমন অনায়াসে তাদের কাজ হাসিল করে যেতো যে, শেষে তারা মানুষ নয় এমনি একটা জন প্রবাদ সমস্ত কম্বোজের অশিক্ষিত মাঝিমাল্লার ভেতর রটে গেল।

বাণিজ্যতরীর জন্য মাঝিমাল্লা পাওয়া ক্রমে দুষ্কর হয়ে উঠল। তারা

মানুষের বিরুদ্ধে লড়ে জান দিতে প্রস্তুত কিন্তু দেবতার বিরুদ্ধে তারা কি করতে পারে এই হোল তাদের বুলি। পূর্ব উপকূলের ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম বন্ধ। উপরওয়ালাদের তাড়া খেয়ে পুলিশ ও নৌ-সেনা মরিয়া হয়ে জলদস্যু দমনে লেগে গেল। কিন্তু কিছুই হোল না। কম্বোজের পূর্ব উপকূলে দস্যুদের প্রতাপ অক্ষুন্নই রইল। জলদস্যুরা যে মানুষ নয় এই জনরব এই সব ব্যাপারে আরো বিস্তৃত হয়ে পড়লো।

পঞ্চাশ বছর বাদে কম্বোজে এখনো সে প্রবাদ লোকের মুখে শোনা যায়। তার কারণঃ আছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সাইগনের কাছে একটি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত মসলা বোঝাই প্রকাণ্ড ষ্টীমার লুট হয়ে যায়। কাম্বোজে সেই প্রথম ষ্টীমার—যদিও সেকেলে কিন্তু সাধারণ স্লুপের চেয়ে অনেক বড়। এই ষ্টীমার লুট হওয়ার পর সেখানকার সদাগর মহলে রীতিমত বিভীষিকা দেখা দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ষ্টীমারই জলদস্যুদের শেষ লুট। তারপর কম্বোজের প্রান্ত থেকে তারা যেন জাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে যায়। যাদের দাপটে সারা সমুদ্র একদিন থরহরি কম্পিত হত, হঠাৎ তারা কেন এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্তর্ধান হতে পারে এ রহস্যের কোনো মীমাংসা হয় না। এরপর জলদস্যুদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি কিংবদন্তী রটা আশ্চর্য মোটেই নয়।

কম্বোজের সরকারী দপ্তরে এই রহস্যময় ব্যাপারের উল্লেখ আছে, কিন্তু কেমন করে তারা লোপ হয়ে গেল, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

যে সমস্যার কথাই কখনও শুনিনি, সুদূর বাঙ্গলা দেশের একটি শহরে বসে তার সমাধান জানতে পারবো একথা কে ভেবেছিলো। যে রকম সামান্য ব্যপারের ভেতর দিয়ে এই রহস্যের কথা জানতে পারি তা ভাবলে এখন বিস্ময় লাগে।

সুধীরদের বাড়ী সেদিন সকালে নিমন্ত্রণ ছিলো। নিমন্ত্রণ এমন তাদের বাড়ী প্রায়ই হয় কিন্তু সেদিন একটি বিশেষ উপলক্ষ্যও ছিলো।

সুধীরের জ্যোঠামশাই সুদূর সুমাত্রায় ডাক্তারী করতেন, বহুদিন বাদে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন—সেই উপলক্ষ্যেই খাওয়ার আয়োজন।

এ কয়দিন স্কুলে ও স্কুলের বাইরে সুধীরের মুখে তার জ্যোঠা-মশায়ের কথা ছাড়া আর কোনো কথা ছিল না। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এমন কি অসাধারণত্ব থাকতে পারে যাতে চোদ্দ বছরের কিশোরের মন মুগ্ধ হয়ে যায় এতদিন বুঝতে পারিনি। কিন্তু বঙ্কিম-বাবুকে দেখামাত্র সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম? বৃদ্ধ সত্যই অসাধারণ। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর ভেতর অমন চেহারাই দুর্লভ। সত্তর বৎসর বয়স যে তাঁর হয়েছে একথা তিনি নিজে না বললে বিশ্বাস করাই কঠিন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে বয়সের চিহ্ন আছে বটে কিন্তু বার্ধক্যের জীর্ণতার পরিচয় নেই। গাম্ভীর্য দূরে থাক, মুখে বালকের কৌতুকের হাসিটি লেগেই আছে। ছোটো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজে মিশে যাবার দেখলাম তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।

তাঁর জীবনের বিবরণ যা শুনলাম তাও অদ্ভুত। অত্যন্ত ডান-পিটে দুরন্ত ছিলেন ছেলেবেলায়। সেজন্যে তাঁকে নানারকম শাস্তি ঘরে-বাইরে সহ্য করতে হয়েছে। স্কুল থেকে একবার কি কারণে বিতাড়িত হয়ে তিনি আর লজ্জায় বাড়ী ফেরেন না। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর খবর না পেয়ে সকলে তাঁর জীবনের আশা পর্যন্ত ত্যাগ করে-ছিলো। অবশেষে একদিন বিলাতের ডাকে তাঁর বাবার নামে একটি চিঠি এসে হাজির। চিঠি খুলে তিনি তো অবাক। যে ছেলে স্কুলে কোনো রকমে প্রমোশন পাবে কিনা বছরের শেষে সেই দুশ্চিন্তায় তাঁকে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটাতে হত, বিলাত গিয়ে সে সেখানকার প্রবেশিকার বেড়া উৎরে একেবারে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। শুধু ভর্তি হয়নি সেখানে পড়াশুনায় দস্তুর মতো কৃতিত্ব দেখিয়ে সে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশংসালাভ করেছে।

তারপর সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে সসম্মানে পাশ হয়ে

দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ঘরে বসে থাকা তাঁর ধাতে সইবে কেন। কিছুদিন বাদেই সুমাত্রার কাছে একটি বড় হাসপাতালের ভার পেয়ে তিনি আবার সাগরে পাড়ি দেন।

সেই বিদেশেই তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি দেশে শেষ জীবন কাটাবার জন্যে ফিরেছেন।

এই বিবরণ শুনেই তখন বিস্মিত হয়েছিলাম, জানতাম না যে তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে, যার কাছে এ সমস্ত ব্যাপার নিতান্ত তুচ্ছ সাধারণ।

সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। সুধীরের জ্যাঠামশাই নানা রকম মজার গল্প করে খাওয়ার আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। সুমাত্রার লোকেদের একরকম অদ্ভুত নিয়মের কথা বলছেন এমন সময় হঠাৎ পাতার দিকে চেয়ে তাঁর মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন—"না না ও আমি খাই না—ও কাঁকড়া তুলে নিয়ে যাও।"

আমরা তার মুখ দেখে চুপ করেছিলাম, সুধীর তার পাশে বসে ছিলো অত লক্ষ্য করে নি, বললে—"কেন জ্যাঠাবাবু এই বুঝি আপনার দাঁতের জোর। কাঁকড়ার দাঁড়া চিবোতে পেছিয়ে যাচ্ছেন।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—"দাঁতের জোর ঠিক আছে রে। কিন্তু ও কাঁকড়া দেখলে আমার সমস্ত শরীর কেমন করতে থাকে।" তারপর উঠে পড়ে বললেন "আমার খাওয়া হয়ে গেছে বাপু বুড়ো মানুষ বসে থাকতে পারলুম না—কিছু মনে কোরনা যেন।"

খাওয়া তাঁর তখনও হয়নি। আমরা সবাই সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সুধীরের বাবা ছুটে এসে বললেন—"ওকি দাদা কিছু না খেয়েই উঠে পড়লে যে? "হয়েছে হয়েছে আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এখন কি আর আগের মত খেতে পারি।"—বলে বঙ্কিমবাবু এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যেন এ ঘরে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কাঁকড়া পাতে দেওয়ার পর একি হল আমরা বুঝতে না পেরে থ হয়ে রইলাম।

দুপুর বেলা বাইরের ঘরে বসে সুধীর বললে, "কেন খেলেন না আপনাকে বলতেই হবে জ্যাঠাবাবু?"

দু একবার এড়াবার চেষ্টা করে বঙ্কিমবাবু অবশেষে একটু হেসে হেসে বললেন—"কাঁকড়া দেখলেই আমার অজ্ঞান হবার মত হয়—তাই না উঠে পারলাম না।"

"কেন জ্যাঠাবাবু?" সুধীর অমনি ছাড়বার ছেলে নয়। খানিক চুপ করে বঙ্কিমবাবু বললেন—"তবে শোন্ কিন্তু শেষকালে আমাকে পাগল ভাবিস নি যেন। এই ভয়ে পৃথিবীর কাউকে একথা আজো জানাই নি। মানুষের স্বভাব ভারী মজার এত বড় আশ্চর্য দুনিয়ায় বাস করেও অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করতে সে নারাজ।
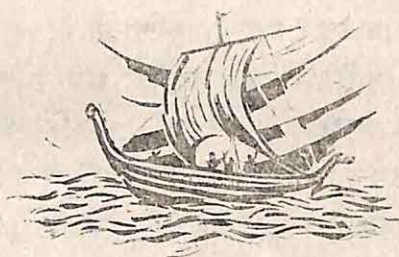
বঙ্কিমবাবু গড়গড়ার নলটি একধারে সরিয়ে রেখে আবার বললেন—"তোরা বড় জোর মনে করবি বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। তা বুড়ো হলে অমন হয়। এককালে এই গল্প বললে হয়তো আমার চাকরী মান সম্ভ্রম সব যেতো। মানুষের অসাধারণের উপর এমনি অবিশ্বাস।'

এইবার গল্প শুরু হল। বঙ্কিমবাবু বলতে লাগলেন পঞ্চাশ বছর আগের কথা—

সুমাত্রায় তখন বছর কয়েক চাকরি করেছি। এমন সময় সেখানে ভয়ানক কাণ্ড শুরু হোল। সুমাত্রায় তখন টিকে দেবার বীজ পাওয়া

ভুঙ্কর ছিলো। শুনলাম সাইগনে একজন ফরাসী ডাক্তার নিজে পরীক্ষাগার করে টিকার বীজ তৈরী করছেন। সেই টিকার বীজ ভালো হলে তাই কিনে আনবো বলে সাইগনে গেলাম। সাইগনে কয়েকদিন থেকে টিকার বীজ সংগ্রহ করে আবার সুমাত্রায় ফেরবার আয়োজন করবার সময় ভয়ানক বিপদে পড়লাম।

—কম্বোজের পূর্ব উপকূলে তখন ভয়ানক জলদস্যুর উৎপাত। আসবার সময় সুমাত্রার মাঝি মাল্লারা তেমন ভয় পায়নি। কারণ সুমাত্রায় এই জলদস্যুদের সম্বন্ধে বেশী গুজব পৌঁছায় নি। কিন্তু সাইগনে কয়েক দিন থেকে নানা কথা শুনে ইতিমধ্যে ভড়কে গিয়ে ছিল তারা। দেশের টানেও এই জলদস্যুদের ভেতর দিয়ে আর যেতে রাজী নয়। শুধু লুটতরাজই নয় অকারণে মানুষ মারতেও এই দস্যুদের নাকি আনন্দ।

ফেরবার জাহাজ না পেয়ে কি করবো ভাবছি এমন সময় সেই ফরাসী ডাক্তার খবর দিলেন যে একটি ফরাসী কোম্পানী নূতন একটি ষ্টীমার আনিয়েছে। কাল সে ষ্টীমার প্রথম যবদ্বীপ হয়ে সাইগনে আসবে। তাইতে আমি আবার সুমাত্রায় ফিরতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি —হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। শুধু মাঝি মাল্লাদেরই দোষ দেব কেন এই জলদস্যুদের সম্বন্ধে আমারই মনে যথেষ্ট ভয় ছিলো। সাধারণ পাল-তোলা জাহাজে যাওয়া কত বিপজ্জনক তাও জানতাম, অকারণে প্রাণ হারাবার বাসনাও ছিলো না। এই ষ্টীমারটিতে যেতে পেয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলাম।

এই দেশে এই প্রথম ষ্টীমার। সে ষ্টীমার আক্রমণ করা দূরে থাক, ষ্টীমার দেখলে জলদস্যুরা বোধহয় ভয়েই খুন হবে।

সঙ্গে বেশী কিছু জিনিসপত্র ছিল না। টিকের বীজই আসল জিনিস। অত্যন্ত সাবধানে তাই নিয়ে কয়েকদিন বাদে ষ্টীমারে উঠলাম। প্রকাণ্ড মজবুত ষ্টীমার। জলদস্যুদেরই জন্যে তার দুই প্রান্তে দুটি কামান বসানো। তা ছাড়া ষ্টীমার রক্ষা করবার

জন্যে জন পঞ্চাশ সৈন্যও নেওয়া হয়েছিল। ষ্টীমারে উঠে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আসুক জলদস্যু।

সকালে ষ্টীমার ছেড়ে সন্ধ্যায় যখন মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি তখন পর্যন্ত জলদস্যুদের কোন চিহ্ন দেখা গেলনা বলে একটু হতাশ যেন হলাম। জলদস্যুদের মজাটা একবার টের পাইয়ে দেবার সুবিধে হলনা বলে।

কিন্তু জলদস্যুরা এল।

রাত তখন বেশী নয়। চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ ষ্টীমারের প্যাড্‌লের গম্ভীর আওয়াজ ছাড়িয়ে ষ্টীমারের তীক্ষ্ণ হুইসল শোনা গেল। পর মুহূর্তে ষ্টীমারের ইঞ্জিন থেমে গেল। ব্যাপার কি?

যাত্রীরা সবাই সামনের ডেকে গিয়ে ভিড় করলাম।

ক্যাপ্টেন সসব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৈন্যরা কামান বন্দুক বাগিয়ে ঠিক হয়ে আছে। সামনে বহুদূরে গুটিকতক আলো দেখা যাচ্ছে।

শুনলাম, আলো আর কিছুর নয়, জলদস্যুদের নৌ বহরের। এবার অন্ততঃ তারা আক্রমণ করতে আসেনি। আমরাই তাদের আক্রমণ করছি।

ষ্টীমার থেকে একসঙ্গে কামান ও বহু বন্দুক গর্জন করে উঠল।

জলদস্যুরা আমাদের এতক্ষণ দেখতে পায়নি বলে মনে হল। কারণ দেখা মাত্র টপ টপ করে নৌকোর আলো সব নিবিয়ে ফেলল। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন ছাড়বার পাত্র নন, বললেন, "অন্ধকারেই গুলি চালাও।"

তখন সার্চ লাইট বলে কিছু ছিল না। থাকলে আমাদের অমন সর্বনাশ বোধ হয় হত না।

অন্ধকারেই গুলি চলতে লাগল। জলদস্যুদের স্লুপগুলিতে মাঝে মাঝে কোথাও আলো জ্বলে উঠে। আমাদের ষ্টীমার তাই দেখেই তাদের ধাওয়া করে, আর গুলি চালায়।

ক্যাপ্টেন বলছেন শুনতে পেলাম—"আজ আর রেহাই দেওয়া নেই। ভীমরুলের চাক ভেঙ্গে তবে ছাড়ব।"

ষ্টীমার ক্রমশঃ তাদের স্লুপগুলির বরাবর এসে পড়েছিল। অন্ধকারেও অস্পষ্ট ভাবে স্লুপগুলি দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ সবাই ষ্টীমারের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে গেলাম। তার সঙ্গ ভয়ঙ্কর আওয়াজ।

প্রকাণ্ড ষ্টীমারটা যেন মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়ে কেঁপে উঠল।

ষ্টীমার চোরা পাহাড়ে ঠেকে গেছে।

ক্যাপ্টেনও পড়ে গিয়েছিলেন। উঠে পড়ে উন্মত্তের মত তিনি ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন থামিয়ে দিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তলায় প্রকাণ্ড চিড় হয়ে জাহাজে তখন রাশি রাশি জল ঢুকছে।

জলদস্যুরা যে এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রলোভন দেখিয়ে এ—পথে টেনে এনেছে তা কে জানত।

ষ্টীমার ঠেকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুরু হল তার আর বর্ণনা হয় না। জলদস্যুদের কয়েকটি মাত্র স্লুপ ষ্টীমারকে প্রলোভন দেখিয়ে ডুবো পাহাড়ে ঠেকবার জন্যে সামনে ছিল। তাদের বেশীরভাগ স্লুপই ছিল পেছনে। তারা ইতিমধ্যে কোথা থেকে এসে ছেঁকে ধরল।

অন্ধকারে চারিদিকে শুধু-ভীত যাত্রীদের আর্তনাদ। জলদস্যুরা নৃশংস ভাবে তাদের হত্যা করতে শুরু করে দিলে, এই জলদস্যুদের হাতে মরার চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল বলে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল তখন দিন। দেখি হাত পা বেঁধে আমায় একটি স্লুপের উপর দস্যুরা ফেলে রেখেছে। বুঝলাম ষ্টীমার ডুবেছে এবং আমায় এরা ক্রীতদাস করে নিয়ে চলেছে। অনেক কষ্টে হাত পা

বাঁধা অবস্থায় উঠে বসলাম। সামনে দেখলাম সমুদ্রের মাঝে প্রচণ্ড এক পাহাড়। এই পাহাড়টিকে চিনতাম। জাহাজ-টাহাজ এই পাহাড়ের পাশ দিয়েই যাতায়াত করে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পরবার ভয়ে কেউ বড় কাছে ঘেঁষেনা।

এখন দেখে আশ্চর্য হলাম যে, জলদস্যুদের নৌকোগুলি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্র থেকে পাহাড়টি খাড়া উঠেছে জানি। তার কোথাও নৌকো দূরের কথা কোনো মানুষের দাঁড়াবার আশ্রয় নেই। তবে এই জলদস্যুরা চলেছে কোথায় ? এই পাহাড় তাদের ঘাঁটি হলে অনেক দিন আগে তারা ধরা পড়ে যেত। সমস্ত বাণিজ্য জাহাজ এই পাহাড়ের ধার দিয়েই ত যায়।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছে কিন্তু জলদস্যুদের আড্ডার রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাহাড়ের চারধারে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা না থাকলেও একধারে একটি নাতিবৃহৎ গুহা পথ রয়েছে। সমুদ্রের জল তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে। আমাদের স্লুপটি ক্রমশঃ এগিয়ে এসে তার ভেতরে ঢোকামাত্র সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গুহাপথটি বেশী চওড়া নয়। আমাদের স্লুপ অতিকষ্টে তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বুঝলাম।

কিন্তু কোথায় ?

অন্ধকারে এমন প্রায় মিনিট দশেক কাটল এবং তারপর চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখি সামনে প্রকাণ্ড জায়গা। তার মাঝে একটি ছোট হ্রদের মত। সমুদ্রের জল সেই হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। স্লুপ-গুলি সেই হ্রদের একধারে ভিড়ল। সমুদ্রের পাহাড়ের মাঝখানে এমন স্থান ছিল কে জানত ? এইখানে মানুষের অগোচরে জলদস্যুরা নির্ভয়ে তাদের লুটের মাল সঞ্চয় করে বসবাস করে।

আমায় ধরে স্লুপ থেকে নামিয়ে দেবার পর দেখলাম আমার মতো আরো অনেককে তারা বন্দী করে এনেছে তাদের দাসবৃত্তি করার জন্য।

এরপর আমাদের যে জীবন শুরু হল তার দুঃখ আর বলে শেষ করা যায় না। মানুষ যে এমন পিশাচ হতে পারে এই জলদস্যুদের দেখবার আগে তা কখনও কল্পনা করিনি। সারাদিন তাদের জন্যে অকারণে হাড়ভাঙ্গা খেটে ভালো করে একটু খাবার উপায়ও আমাদের ছিল না। চোখের সামনে তারা উন্মত্ত হয়ে সেই খাবার ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করত, কিন্তু আমাদের আধপেটা খাওয়াও তাদের সহ্য হত না।

সারাদিনের পর একটিবার মাত্র দাসদের অত্যন্ত কদর্য আহার মিলতো। সেই কদর্য খাবারও সুখে খাবার উপায় নেই। জল-দস্যুদের ত লুট করা ছাড়া আর কাজ নেই। একজনের হয়ত ইচ্ছে হল ক্রীতদাসদের নিয়ে একটু মজা করা যাক। খেতে বসেছি—হঠাৎ হাসতে হাসতে এসে লাথি মেরে সব বার ফেলে দিলে। কুড়োতে গেলে আবার লাথি। প্রতিবাদ করতে গেলে একটি তরোয়ালের খোচায় ভবলীলা সাঙ্গ।

ক্রীতদাসদের একজোট হয়ে বিদ্রোহ করবার উপায় নেই কারণ প্রথমত—আমরা অস্ত্রহীন, দ্বিতীয়ত, আমাদের সকলের পায়ে বেড়ি। সেই বেড়ি নিয়েই আমাদের চলতে-ফিরতে হত।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। যে সাহেবি পোশাকে এসেছিলাম, সেই পোশাকের আর পরিবর্তন হয়নি। সেটি ছিঁড়ে খুড়ে প্রায় কুটি কুটি হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে নজরও আর ছিল না। একদিন কিন্তু সেই পোশাক থেকে একটি জিনিস খুজে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য উল্লাসিত হয়ে উঠলাম।

বসন্তের টিকার বীজ নিয়ে যেতে সাইগনে এসেছিলাম বলেছি। সে সমস্ত টিকার বীজের শিশি সমুদ্রে ষ্টীমারের সঙ্গেই ডুবেছিলো। কিন্তু তার ভেতর একটি কবে দেখবার জন্য বার করে ভুলে ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রেখেছিলাম মনে নেই। ওপরের কোটটি একেবারে ছিঁড়ে যাওয়ায় একদিন খুলে ফেলে দিলাম। সেদিন ওয়েষ্ট কোটের পকেটে হঠাৎ হাত দিয়ে সেই শিশিটি পেলাম। শিশিটি কিসের

বুঝতে পেরে আমার আনন্দের সীমা রইল না। এতদিনকার অমানুষিক অত্যাচারের এইবার শোধ নেব। মরুক এই পিশাচের দল।

আমার কাছে যে টিকার বীজ ছিল, তা শোধন করা নয়। সুমাত্রায় গিয়ে তা আমি শোধন করে ব্যবহার করব বলেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই অশুদ্ধ বীজের এতটুকু একজন দস্যুর রক্তে মিশিয়ে দিলে যে মহামারী শুরু হবে তা থেকে কেউ বাঁচবে না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। উন্মত্তের মত কি ভাবছি! হাজার হলেও আমি ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানই আমার ব্রত, আমি কিনা মৃত্যুর বাহন হয়ে মানুষকে মারতে যাচ্ছি। হোক সে শত্রু, হোক সে অত্যাচারী, চরম উৎপীড়ন সয়েও একাজ যে আমি করতে পারি না। তাছাড়া শুধুতো জলদস্যুরা নয়, নিরীহ উংপীড়িত ক্রীতদাসেরাও যে এই মহামারীতে মারা যাবে।

কিন্তু বিধাতার শাস্তি তারা শেষ পর্যন্ত পেল, অদ্ভুত উপায়ে।

আমার কাজ ছিল, আর কয়েকজন দাসের সঙ্গে হ্রদের জলে মাছ ধরা। আমরা ছোটো একটি নৌকো নিয়ে সারাদিন হ্রদে ঘুরে ঘুরে জাল ফেলে ফেলে মাছ ধরতাম। একদিন সকালে হঠাৎ প্রথম জাল তুলে অবাক হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত জাল লাল রঙে যেন চোবান। একটু নজর করে দেখতে মনে হল, জালময় যেন ছোটো ছোটো লাল কাঁকর উঠেছে এবং পরক্ষণেই দেখলাম সে কাঁকর নড়তে শুরু করেছে। কাঁকর নয় সে কাঁকড়ার ছানা।

এদেশে কোনো কোনো নদীতে বৎসরে এক সময়ে অমনি কাঁকড়ার ছানা হয়। নদী ভরে যায়, আঁচলে করে তুললে তাতে অসংখ্য ছানা কিলবিল করে।

তৎক্ষণাৎ জাল আবার ফেলে দেওয়া হল। তাতে কি হবে? কাঁকড়ার ছানারা সমস্ত নৌকো ছেঁকে ধরেছে। তারা শুধু নৌকোয় উঠেই ক্ষান্ত হয়না—সুড়সুড় করে দলে দলে গায়ে ওঠে। তাদের ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই দায়; পাঁচটাকে ঝাড়তে পঞ্চাশটা উঠে পড়ে।

তাদের মাড়াতেও কষ্ট হয় কিন্তু না মাড়িয়েও উপায় কি। বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে এই সমুদ্রের পঙ্গপাল এল! সমুদ্রের পঙ্গপাল কথাটি তাদের পক্ষে কি রকম যে খাটে সেদিন তা বুঝতে পারলাম।

কিছুক্ষণ বাদে নৌকোয় থাকাও অসম্ভব হল। মাছ তো সেদিন সামান্যই মিলল। তাই নিয়ে পাড়ে উঠে দেখি, পাড়েরও বহুদূর পর্যন্ত সেই কাঁকড়ার ছানায় ছেয়ে গেছে।

মাছ না পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট উৎপীড়ন অবশ্য সহ্য করতে হয়েছিলো। পরদিন সকালে কিন্তু হ্রদের ধারে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। তীরের বহুদূর থেকে দেখা যায় সমস্ত হ্রদের জল রক্তের মত রাঙ্গা হয়ে গেছে। কাঁকড়াগুলো একদিনেই যেন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে।

আমরা আগের দিন কাঁকড়ার জন্যে মাছ ধরতে পারিনি বলে কৈফিয়ৎ দেওয়ায় একজন দস্যু আমাদের সঙ্গে আমাদের কথা সত্যি কিনা যাচাই করতে এসেছিলো। আমাদের একজন সেই কাঁকড়ার সমুদ্রে দেখিয়ে বললে, "কেমন আমরা মিথ্যে বলেছিলাম, ওই কাঁকড়ার ভেতর মাছ পাওয়া যায়?" তার মুখে এক ঘুঁসি মেরে দস্যু বললে, —"তাই ধরতে হবে।"

তাই ধরতে গেলাম। কিন্তু হ্রদে পৌঁছতে পারলে তো। তীরের উপরেই কিলবিল করে কাঁকড়ার পাল গায়ের উপর উঠতে থাকে। শুধু গায়ে ওঠে না। তারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু কামড়াতে শিখেছে। কত তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়। খানিক দূর গিয়ে বাধ্য হয়ে ফিরলাম। যে দস্যু তদারক করতে এসেছিলো এবারে সে কিন্তু কিছু বললে না।

সত্যিকার বিপদ তার কয়েকদিন পর থেকে শুরু হল। সকাল বেলায় হঠাৎ কিসের কামড় খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমাদের শোবার কোন জায়গা ছিল না। মাঠের ওপর যেখানে সেখানে গরু-ঘোড়ার মত আমরা শুয়ে থাকতাম।

উঠে দেখি, চিতি কাঁকড়ার আকারে একটি লাল কাঁকড়া সজোরে দাঁড়া দিয়ে একটি আঙ্গুল কামড়ে ধরেছে। আশে পাশে আরো বিস্তর কাঁকড়া ছুটে বেড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে সে কাঁকড়াটাকে পা থেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এ কয়দিনের মধ্যে কাঁকড়ারা আকারে দ্বিগুণ হয়ে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে দেখে, সত্যিই অবাক হয়েছিলাম।

চারদিকেই কাঁকড়ার পাল। এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কথা কখনও শুনিনি বা পড়িনি। প্রকৃতির নিয়মে সব নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরই প্রথমে এই রকম বংশবৃদ্ধি হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশই মারা যায়। না গেলে পৃথিবীতে মানুষের বাস করা অসম্ভব হত। দস্যুদের দেখলাম একটা নতুন খেলা জুটেছে, কাঁকড়া মারা। তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে কাঁকরা মেরে বেড়াচ্ছিল। বিকেলের দিকে তাদেরও প্রাণে কিন্তু ভয় না হোক দুশ্চিন্তা দেখা দিল। এই কাঁকড়ার পাল না গেলে রাত্তিরে শোবার জায়গাও যে মিলবে না। হ্রদ থেকে পালে পালে এসে তারা যেখানে যা কিছু আছে সব অধিকার করে ফেলেছিল। দস্যুদের প্রকাণ্ড ভাঁড়ার ঘরের চারধারে পঁচিশ জন দাস শুধু কাঁকড়া মারবার জন্যেই মোতায়েন রাখতে হয়েছিল! কিন্তু তারাও হয়রান হয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত মেরে মেরে একদল ক্লান্ত হয়ে গেলে, আর এক দল তাদের জায়গা নিচ্ছিল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্বেও কাঁকড়ার পালের ভাঁড়ারে ঢোকা বন্ধ করা গেল না।

রাত্রে কোথায় শোয়া হবে সেই হল সব চেয়ে সমস্যা। সমস্ত পাহাড় ঘেরা দ্বীপ কাঁকড়ায় ছেয়ে গেছে। সে দ্বীপে যা কিছু আহার্য ছিল, তা প্রায় শেষ করে ফেলে ক্ষুধার জ্বালায় তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। আমরা যে তাদের ভক্ষ্য নয়,—একথা তাদের বোঝান ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছিলো। সে রাত্রে আর ক্রীতদাসে প্রভুতে প্রভেদ হইল না। সবাই যে যার দেহ বাঁচিয়ে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। অনেক কষ্টে একটুখানি পরিস্কার জায়গা পেয়ে, শুয়ে একটুখানি না ঘুমোতে ঘুমোতেই কাঁকড়ার কামড়ে অস্থির হয়ে জেগে উঠতে হয়।

সে কাঁকড়ার শক্ত দাড়া আবার না ভাঙ্গলে ছাড়ারার উপায় নেই। সারারাত এমনি পাগল হয়ে সকাল বেলা যে ব্যাপার দেখলাম—তাতে সমস্ত রক্ত জল হয়ে উঠল ভয়ে। একজন দস্যু অনেক রাত্রে অত্যন্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। কাঁকড়ার তার রক্তাক্ত কঙ্কালটি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

সকাল হলেও বিপদ বাড়ল বই কমল না। আগে শোবার জায়গা পাওয়া দুষ্কর হয়েছিলো। এদিন দাঁড়িয়ে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠল।

সমস্ত দ্বীপ রাঙা হয়ে গেছে কাঁকড়ায়। তারা পাহাড়ে পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় গিয়ে উঠছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই। অনবরত গা ঝেড়ে চলে না বেড়ালে তারা কামড় দেবেই একটি নয় এক সঙ্গে পঞ্চাশটি।

সেদিন যে কিভাবে গেল, ভাল করে স্মরণও হয় না। আহার নেই নিদ্রা নেই, সারাদিন ছুটে বেড়াচ্ছি। কাঁকড়া মেরে মেরে হাতপা অবশ হয়ে গেছে, আর হাতের লাঠি নড়াতেও ইচ্ছা করে না। কোন রকমে একটু নড়ে বেড়াবার শক্তিটুকু আছে। সমস্ত দ্বীপে বড় কোন গাছ নেই—থাকলেও এ কাঁকড়াদের হাত থেকে নিস্তার পেতাম না।

সন্ধ্যার সময় পায়ের একটা আঙ্গুল কাটা গেল। কাঁকড়াটাকে লাঠির বাড়ি মেরে গুঁড়িয়ে ছাড়ালাম, কিন্তু তার দাঁড়া ততক্ষণ জম্পেশ হয়ে পায়ে বসেছিলো।

আগের রাত্রে মশাল জ্বালা হয়েছিল। এ রাত্রে সমস্ত অন্ধকার। কে মশাল জ্বালবে? কে কোথায় আছে তারি খোঁজ হয়না। কোন উপায় না দেখে অবশেষে পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করলাম, সেখানে হয়ত কাঁকড়ার ভিড় একটু হাল্কা হবে ভেবে! কিন্তু সে আশা বৃথা। যতদূর যাই, সেই এক কাঁকড়ার সমুদ্র। তবু যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ বুঝবই মনে করে এগিয়ে চললাম। এধারে পাহাড় ঢালু হয়ে উঠেছে। তার গাময় সেই কাঁকড়ার লাল ছোপ। অনেক উপরে উঠলে হয়তো নিস্কৃতি পেতে পারি মনে করে ক্লান্ত পদ টেনে টেনে চলতে লাগলাম।

পাহাড়ের গায়ে নানা জায়গায় ছোট ছোট গুহা। ওরই একটির মধ্যে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারলেও যেন সুখ পাই মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় চমকে উঠলাম। এতক্ষণ এই কথাটি মনে পড়েনি—এমনি আমি নির্বোধ। পাহাড়ের গায়ে অজস্র শুকনো ঘাস রয়েছে। একটি ছোট গুহা বেছে, তার ভেতর থেকে কাঁকড়া তাড়িয়ে যদি গুহামুখে এই শুকনো ঘাস জড় করে আগুন করতে পারি, তাহলে তো কাঁকড়া ঢুকতে পারে না। জানি সে ক্ষণিকের নিষ্কৃতি। বরাবর সে আগুন বজায় রাখবার মত ঘাস জোগাড় করতে আমি পারব না শেষ পর্যন্ত কাঁকড়ারা ঢুকবেই, কিন্তু তবু কিছুক্ষণের জন্যে তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবো—তারপর আসুক মৃত্যু।

সেই আশায় যেন নতুন বল পেয়ে উন্মত্তের মত শুকনো ঘাস সংগ্রহ করে ছোট একটি গুহা খুঁজে তার মুখে জড় করতে লাগলাম। এই ছোট গুহার ভেতরও কাঁকড়া ঢুকছে কিন্তু চেষ্টা করলে তাদের মেরে গুহাটি নিরাপদ করা বোধহয় যেতে পারে। অবশ্য যদি বাইরে থেকে নতুন কাঁকড়া আর ঢুকতে না পারে। ঘাস সংগ্রহ প্রায় শেষ হয়েছে, অন্ততঃ চার পাঁচ ঘণ্টা সে ঘাসের আগুন বেশ জ্বলতে পারবে বুঝে গুহার ভেতর ঢুকতে যাব, এমন সময় মাথা ঘুরে গুহার মুখেই ঘাসের ওপর মুখ গুজে পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ কোমরের ওপর প্রচণ্ড এক কামড় অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় করে কি যেন ভেঙ্গে গেল এবং তারও একটি অংশ দেহে ফুটল বুঝতে পারলাম। এক খামচা পেটের কাছে মাংস সমেত কাঁকড়াটাকে যখন ছাড়িয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম, তখন মনে পড়ল ওয়েষ্ট কোটের পকেটে টিকার বীজের শিশি ছিলো। সেইটাই ভেঙ্গেছে।

সে নিয়ে তখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে অনেক কষ্টে পাথর ঠুকে আগুন জ্বেলে গুহার মুখে শুকনো ঘাস ধরালাম।

ধীরে ধীরে গুহার মুখে আগুনের বেড়া তৈরী হয়ে গেল। বেড়া ডিঙ্গিয়ে কাঁকড়ারা আর ঢুকতে পারবে না।

এইবার ভেতরে কাঁকড়া মারায় মন দিলাম। হাত আর চলে না। তবু প্রাণপণে আধঘণ্টা চেষ্টার পর গুহার ভেতরটা নিরাপদ করা গেল। তখন আর দেহের সাড় ছিল না। কাঠের মত পড়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

যখন উঠলাম গুহার দরজার আগুন নিবে গেলেও ভেতরে তাত ছিল। দেখলাম, বাইরে কাঁকড়া গিজগিজ করলেও ভেতরে তারা ঢুকতে পারছে না। গুহার ভেতরে যে শুকনো ঘাস অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে আবার কষ্ট করে আগুন জ্বাললাম। আগুন আর বড় জোর ঘণ্টা দু'এক আমায় বাঁচাতে পারে! তবু সেইটুকুই যথেষ্ট।

সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও বেদনা বোধ করছিলাম। বেদনা হওয়া আশ্চর্য নয়—সমস্ত দেহ অসাড় হয়নি এই আশ্চর্য।

কিন্তু গায়ে আমার এসব কি? ঘাসগুলো বেশ ভালো করে জ্বলে ওঠামাত্র নিজের গায়ের দিকে চেয়ে কেঁপে উঠলাম। আমার সর্বাঙ্গে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। বুঝলাম যে বীজে একদিন দস্যুদের মারবার কল্পনা করেছিলাম—তাই ভাঙ্গা শিশি দিয়ে আমার গায়ে ঢুকে এই রোগের সৃষ্টি করেছে।

প্রথমটা ভয় হচ্ছিল, শেষে মনে হল তাতে আর কি, মরতে তো হতই। বেশীক্ষণ জ্ঞানও রইল না, জ্বরের ঘোরে খানিক বাদে বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

কদিন যে সে অবস্থায় কেটেছিল জানি না। রোগের মধ্যে কি করেছি না করেছি তাও মনে নেই। সেবার যদি মরতাম, কোনো কষ্ট পেতে হোতনা—আমার জ্ঞান ছিল না।

একদিন সকালে হঠাৎ চোখ খুলে মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেহ অত্যন্ত দুর্বল, নড়তে কষ্ট হয়—তবু কেমন যেন ভালো মনে হচ্ছিল।

চেষ্টা করে উঠে বসলাম! তার পরই মনে পড়ল সব কথা। কোথায় সে কাঁকড়ার পাল?

গুহামুখে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে মরা কাঁকড়ার খোলা স্তূপাকার হয়ে আছে। গুহামুখে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে দেখলাম, চারদিকে স্তূপাকার মরা কাঁকড়ার খোলা।

দুর্বল দেহেও প্রাণ রক্ষার জন্যে সব করতে হল। কেমন করে সে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেছিলাম, কেমন করে আহার না পেলেও পাহাড়ের খোদলে খোদলে জমা বৃষ্টির জল খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, সে সব বর্ণনার দরকার নেই।

খাবার জিনিসের অভাবে ঘাসের দানা খেয়ে থাকতাম। তখন বুঝেছিলাম—মানুষ সব কিছু পারে। দিন চারেক বাদে শরীরে একটু বল পেলাম। পাহাড় ছাড়িয়ে ক্রমশঃ দস্যুদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

সেখানে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম, তা জীবনে ভুলতে পারব না। চারধারে শুধু মরা কাঁকড়ার খোলা, আর তারই মাঝে মাঝে মানুষের কঙ্কাল। কাঁকড়ারা কেন মরেছে জানিনা কিন্তু সমস্ত মানুষ যে নিঃশেষ করে মেরেছে এটা নিশ্চিত। যে জলদস্যুর ভয়ে একদিন ওদিকে সাগরে মানুষের হৃদকম্প হত—তারা এমনি করে নিঃশেষ হয়ে যাবে কে জানত!

এইখানেই আমার গল্প শেষ। সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপ থেকে কেমন করে একটি ছোটো নৌকোয় করে বাইরে এসেছিলাম, কেমন করে সেই পথে একটি বাণিজ্য তরী আমায় তুলে নিয়েছিল সে সব কথা বলব না।

এই অদ্ভুত কাহিনী অবশ্য কাউকে বলিনি। বললে তারা আমায় পাগলা গারদে না দিলেও চাকরীতে নিশ্চই রাখতো না। তারা ভাবত এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন যে দিনে দুপুরে দেখতে পারে তার নিশ্চয় মাথা খারাপ। তাকে একটা হাসপাতালের কর্তা করে রাখা যায় না।

তাদের বলেছিলাম যে ষ্টীমার ডোবার পর আমি কোন রকমে

ভাসতে ভাসতে সেই পাহাড়ের গায়ে ঠেকি। সেখানেই আমায় একটি বাণিজ্য জাহাজ উদ্ধার করে।

গল্প শেষ হয়ে গেলে, সুধীর জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা জ্যাঠাবাবু, কাঁকড়াগুলো কিসে মরল?"

"তা ঠিক জানিনা, তবে আমার একটা অনুমান আছে।"

"কি জ্যাঠাবাবু?"

"শুনলে তোরা হাসবি; তবু বলি—সেই টিকার বীজ থেকেই কাঁকড়াদের ভেতরও মহামারি হয়। আজকালকার কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে মানুষের অধিকাংশ রোগ পশু, পক্ষী, এমনকি সমুদ্রের জীব-জন্তুদেরও হয়।"

# ভূতেরা বড় মিথ্যুক

ভূতেরা বড় মিথ্যুক।

না, কথাটা আমার নয়। এ শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাসে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাবার মুখে বেশ খালি হয়ে আসা বাস-এর একটি বেঞ্চিতে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ একটি পুঁটলিতে যাঁরা ছেঁড়া-খোঁড়া একটা খেরো খাতা পেয়ে মালিকের নাম-ঠিকানা তাতে খুঁজে পেলে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে সেটা নিয়ে এসেছিলাম, সেই একমেবা-দ্বিতীয়ম ভূত-শিকারী দুর্জ্ঞেয়পরিচয় সেই মেজকর্তাও একথা বলেননি। এ মন্তব্যটি হল মুনশি মুলুকচাঁদের, মেজকর্তার খেরো খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে যাঁর খোঁজ পেয়েছি।

মুনশি মুলুকচাঁদ মেজকর্তাকে বেশ একটু টিটকিরি দিয়েই বলে-ছিলেন "যাদের পেছনে ছুটে-ছুটে মাথার অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন,

এতদিনেও তাদের একটু চিনলেন না! বড়া আফসোস কি বাত কর্তা মশাই, আপনার জন্যে বড়ো দুঃখ হয়, অপনিও এখন জানেন না যে, একদম ষোল আনা সাচ্চা আদমিরও ওপারে গেল জবান ঝুটা হয়ে যায়। সব ভুল ভাল যা মন চায় কিসসা শুনিয়ে দেয় আপনাদের। আর দেবে নাই বা কেন? তাদের যে-রকম জ্বালাতন আপনারা করেন, তাতে আপনাদের নিয়ে একটু বেয়াড়া রসিকতা করে শোধ নিতে চাওয়া তাদের খুব অন্যায় কি?

"এই ধরুন, আপনাদের কী এক নয়া যন্তর এসেছে, কি ওই পেলেনচিট না প্যালান্‌চি কী যেন নাম। কাঠের একটা পানপাতার তলায় তিনটে চাকা বসানো। যেখানে-সেখানে যখন-তখন একটু সুবিধে আর সময় পেলেই ক'জনে মিলে টেবিলের ওপর এই প্যালান্‌চি নিয়ে আপনারা বসে যান। আপনারা ক'জনে ওই কাঠের পানপাতার ওপর হাত রেখে চোখ বুজে বসে যারা ওপারে গিয়েছে তাদের কথা ভাবেন আর তাতেই মনে করেন ওপারের ওরা চুম্বকের টানে লোহার মত ওই প্যালান্‌চিতে এসে ভর না করে পারবে না। তা ওরা তাই আসে আর প্যালান্‌চিতে ভর করে তা যে চালায় তাও ঠিক। কিন্তু কেন আসে জানেন? আসে কখনো-কখনো আপনাদের বুদ্ধিশুদ্ধির দৌড় দেখে আপনাদের নিয়ে একটু মজা করতে। যেমন দু-চারটে অজানা খবর আপনাদের মনের লুকোনো পাতা থেকেই পড়ে নিয়ে আচমকা জানিয়ে দিয়ে তাক লাগানো। তাক লাগাবার পর ওই পানপাতা প্যালান্‌চি নাড়িয়ে যা লেখে তাতেই আপনারা ভয় ভক্তি বিশ্বাসে গদগদ।

"সে যারা যা হয় হোক, আপনার মতো পাকা জহুরি কিনা ওদের কথা শুনে এমন ভুলটা করলেন?"

"যার তার তো নয়," বলেছিলেন মেজকর্তা, "কথা শুনেছি তো খোদ লালা রাজারামের!"

"লালা রাজারামের!" হেসেছিলেন মুনশি মুলুকচাঁদ।

হেসে তিনি কী বলেছিলেন, আর তার জবাবে কী বলেছিলেন

মেজকর্তা, কথাটা উঠেছিল কী থেকে, আর কোথায় কেনই বা এমন সব কথা হয়েছিল তা স্বয়ং মেজকর্তার কাছ থেকে তাঁর নিজের জবানিতে শোনা নিশ্চয়ই ভাল।

"আশা তো দূরের কথা," তাঁর খেরো খাতায় লিখেছেন মেজকর্তা, "যা ভাবতে পর্যন্ত পারিনি তাই এবার সত্যি ঘটেছে একেবারে অবাক করে দিয়ে।

"কিন্তু অবাক বা হই কেন? একটু ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারি, যা সোজা আর হিসেবমাফিক তার চেয়ে উল্টোটা ছুনিয়ায় বড় কম ঘটে না।

"এই যেমন মাছ ধরার বেলায় হামেশা দেখি। বেশ করে আগে থাকতে চার ফেলে নিখুঁত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একেবারে সেরা ছিপ-টিপ নিয়ে আর সবচেয়ে সরেস টোপ ফেলে যেখানে বসি, সেখানে এবেলা ওবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার ধ্যানই কতবার না সার হয়। আর তাইতেই বদমেজাজ নিয়ে ফিরে যেতে-যেতে বেয়াড়া কোনো আঘাটায় নেহাত হেলায়-ফেলায় টোপ-গাঁথা বঁড়শিটা একবার ছুঁড়ে দিয়েছি কি, চোখের পাতা না পড়তে পড়তে চোঁ-চাঁ কিসের টানে জলের তলায় ফাতনা উধাও হওয়ার সঙ্গে স্থতো ছাড়ার বেগে হুইলের গোঙানি যেন আর থামতে চায় না।

"ভাগ্য আর-একটু ভাল হলে সেই দফাতেই শেষ পর্যন্ত হয়ত আধ-মনি একটি মাছের রাজাকে কাটা কলাগাছের ভেলায় চড়ে জল থেকে শেষ পর্যন্ত তুলে আনতে হতে পারে।

"এ যাত্রায় আমার যা হয়েছে তা ঠিক ওই। আমার সেই চিরকেলে নেশার তাগিদে নয়, স্রেফ একটু বিদেশ ঘোরাফেরা আর সেই সঙ্গে যেটুকু তীর্থধর্ম হয় তা সারবার জন্যে কিছু দিনের মতো বেরিয়ে পড়েছিলাম।

"সময়টা মোটেই ভাল নয় বলে অনেকে একটু বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো ডাঙার পথ মাড়াচ্ছি না বললেই হয়। আমার নিজের

ফরমাশ দিয়ে বানানো বজরা, মাঝিমাল্লাও সব আমার পুরনো পাকা লোক। যেখানে যাবার, জলে-জলেই যাব তাদের নিয়ে। ছোটখাটো তো নয়, প্রায় অকূল নদী। এপারে কিছু লোক দেখলে ওপারে গিয়ে ভিড়লেই হল। সুতরাং আমার ভাবনটা কিসের ?

"তা সেরকম ভয়-ভাবনার কিছু হয়নি এ-পর্যন্ত। হেসেখেলে ভেসে-ভেসে অমন দু-দুটো মুল্লুক তো পার হয়ে এলাম, তার মধ্যে কখনো-সখনো রাতবিরেতে গুড়ুম-গাড়ামের মতো যা আওয়াজ শুনেছি তা মেঘের ডাক যে নয়, তা কে বলতে পারে !

"ওসব কিছুর বদলে যা হল তা এই—

"কৃষ্ণপক্ষের নবমী-দশমী। রাত তখন প্রথম প্রহর পার হয়েছে। মেঘে ঢাকা আকাশ যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার নদীর জল। স্রোত আর হাওয়ার সুবিধে নিতে যে-পার ঘেঁষে বজরা যাচ্ছে, সেখানকার সব কিছুও যেন গাঢ় কালির পোঁচ লাগানো।

"এরই মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে বড় মাঝিকে ব্যস্ত হয়ে ডাকলাম, 'দেওলাল ! দেওলাল ! দেখতে পেয়েছো ? শুনতে পাচ্ছ কিছু ?'

"দেওলাল তখন আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। একটু যেন দ্বিধা করে বলল, 'হাঁ সরকার।'

"তাহলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?' একটু ধমকের সুরে বললাম, 'বজরা রোখো, লাগাও ওই ঘাটে।'

'কিন্তু সরকার,' দেওলাল আমার ধমক খেয়েও সামান্য একটু আপত্তি করে, 'দিনকাল বড় খারাপ ! একেবারে অজানা ঘাটে এমন করে বজরা ভিড়নো কি—'

"তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আবার ধমকে উঠলাম, 'দিন-কাল খারাপ তো কী ? অজানা ঘাটে ওই একটা মানুষ আমাদের বজরা সমেত এতগুলো মানুষকে খেয়ে ফেলবে ? মানুষটা আমার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেয়েছ ?'

"এমন অসম্ভব জায়গায় ওই নাম ধরে ডাকাটা যত তাজ্জবই করুক

তা শোনার পর বজরা না থামিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"যেখানে মানুষটাকে দেখেছি, বজরা এতক্ষণে স্রোতের টানে তা ছাড়িয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। সেখান থেকে বজরা ঘুরিয়ে যথাস্থানে লাগাবার হুকুম দিয়ে দেওলাল আমার কাছে ফিরে আসবার পর বললাম, 'যাও, আমার কামরা থেকে বন্দুকটা বরং নিয়ে এসো।'

"দেওলাল বন্দুক আনতে গেল না। আনলে বজরা ঘাটে লাগবার পর রীতিমতো লজ্জাতেই পড়তাম। কারণ এমন একটা অসম্ভব জায়গা থেকে এমন অবিশ্বাস্যভাবে যে আমায় ডেকেছে, সে আর কেউ নয় লাল রাজারাম। তার সঙ্গে এই পথে দেখা হওয়ার ব্যাবস্থা খত লিখে আগে থাকতেই আমাদের ঠিক হয়ে আছে।

"তা থাকলেও লালা রাজারামের এমন জায়গায় এ-সময়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বজরা থামাবার জন্য ডাক দেওয়াটা অবশ্য একেবারে অদ্ভুত কল্পনাতীত ব্যাপার! সেটা কেমন করে সম্ভব হল?

"বজরা পাড়ে লাগবার পর তা থেকে বেশ কষ্ট করেই সেই আঘাটায় নেমে সেই কথাই রাজারামকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, 'এই এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন লালাজি? তোমার তো আমার সঙ্গে কাল সকালে দিলদারনগর ছাড়িয়ে সেই জামানিয়ার ঘাটে দেখা করার কথা!'

"সেখানে কাল সকালে থাকতে পারব না বলেই তোমায় যাবার পথে ধরবার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। জানাল লালাজি।

"তার এ জবাবে বিস্ময়টা বাড়ল বই কমল না। বেশ একটু হতভম্ব হয়েই তাই বললাম, 'কী বলছ লালাজি? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কিন্তু জায়গাটা চৌসা বলেই মনে হচ্ছে। এখান থেকে নদী দিয়ে জামানিয়া যেতে পঞ্চাশ মাইলের কম নয়। এই এতখানি রাস্তার মধ্যে ঠিক কোথায় দাঁড়ালে আমার বজরা ডেকে থামতে পারতে তা তুমি ঠিক করলে কী করে?'

"বুদ্ধু নয় বলেই ঠিক করতে পারলাম।' জবাব দিয়ে লালাজি, বেশ

সোজাভাবেই রহস্যটা পরিষ্কার করে দিল। লালাজি এই অঞ্চলের পয়লা নম্বর কারবারি। এখানকার নদীর হাড়হদ্দ তার জানা। তাই এ-পথে পুব থেকে পশ্চিমে যেতে ছোট বড় সব নৌকাকে স্রোতের প্যাঁচে এই জায়গাটিতে নদীর দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে যেতে হবে জেনেই লালাজি এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল আমার অপেক্ষায়।

লালাজির এই ব্যাখ্যার পরও একটা-দুটো প্রশ্ন মনে জেগেছিল। কিন্তু তা আর না তুলে বললাম, 'যাক, দেখা যখন হয়ে গেছে, তখন বজরায় ওঠো এসে। যেখানে যেতে চাও যেতে যেতে তোমার সব ব্যাপার শুনি।'

"কিন্তু বজরায় উঠতে রাজী হল না লালাজি। বললে, 'না, আমি বজরায় উঠব না। তুমি বজরা এখানে মাঝিদের জিম্মায় বেঁধে রেখে আমার সঙ্গে এসো।'

" 'তোমার সঙ্গে যাব!' এবার সত্যিই একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললাম 'এখানে এই আঘাটায় নেমে কোথায় যাব তোমার সঙ্গে আর যাবই বা কেন?'

" 'যেতে যেতে সব বলছি। এসো।' বলে লালাজি অন্ধকারেই আঘাটায় পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

"লালাজির আবদারটা অত্যন্ত বেয়াড়া হলেও অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। লালা রাজারাম এদিকের এই সমস্ত তল্লাটের মস্ত বড় নামী লোক। শুধু অগাধ ধনী শেঠই নয়, মস্ত বড় দাতা। সারা দেশময় সব বড়-বড় শহর আর তীর্থস্থানে কত ধরমশালা যে সে বসিয়েছে তার

ঠিক নেই। বাংলাদেশে ভাগীরথির ধারের সব তীর্থস্থানে এমনি কিছু ধরমশালা বসাবার ব্যবস্থা করবার সময় তার সঙ্গে আমার আলাপটা দোস্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম একটা সাচ্চা মানুষ আমি খুব কম দেখেছি বলে সাক্ষাৎ দেখাশোনা না হলেও চিঠিপত্রে সে দোস্তিটা আমি ফিকে হয়ে যেতে দিইনি। যত বেয়াড়া আজগুবি মনে হোক, এ-রাত্রে তার ফরমাশ শুনে তার সঙ্গে তাই না-গিয়ে পারলাম না।

"সঙ্গে যেতে যেতে তার কাছে যা শুনলাম তা খুব দুঃখের হলেও একেবারে অভাবিত কিছু নয়। এ অঞ্চলে এখন দারুণ গণ্ডগোল। কুনওয়ারা সিং আবার কাছে জগদীশপুরে কোম্পানির গোরা পল্টনের কাছে হেরে গেছে। তার সঙ্গে যোগ ছিল বলে কোম্পানির ফৌজ রাজারামের জামানিয়ার কুঠির ওপর চড়াও হয়ে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। সেখানে আর তার থাকবার উপায় নেই বলেই লালা রাজারাম আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

" 'কিন্তু কী দরকার ছিল অত বড় বিপদের পর তোমার এত কষ্ট করে আমার জন্য এখানে এসে দাঁড়াবার?' আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমার তো কোনো সত্যিকার দরকার নেই। এই পথে যাচ্ছিলাম বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

" 'বাঃ!' লালাজি আমার কথায় যেন দুঃখ পেয়ে বললে, 'আমি কথা দিয়েছিলাম না যে, তোমার সঙ্গে দেখা করব? আমার কথার কোনো দাম নেই?'

"লালাজির নরম জায়গাটায় ঘা লাগাবার ভয়ে কথাটা ওইখানেই চাপা দিয়ে এতক্ষণের সত্যিকার যা নিয়ে উৎকণ্ঠা সেই প্রশ্নটাই করলাম। 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?

"শুধু আবাদা দিয়ে উঠে নয়, অন্ধকারে আদাড়-পাদাড় বন-জঙ্গল আর ছড়ানো ইট-পাথরের পোড়ো জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে যেভাবে এতক্ষণ এসেছি, তাতে এই প্রশ্নটাই আগে করার কথা। রাজারামের কথায় বাধা দিতে চাইনি বলেই এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

" প্রশ্নটা শুনে লালাজি মনে হল যেন একটু ঠাট্টার সুরে আমার কথাটাই আবার আউড়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছি ? এখুনি দেখতে পাবে।'

"তা সত্যিই পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন সামনে একটা কালো পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে মনে হল।

"পাহাড় নয়, বিরাট একটা সাবেকি মঞ্জিল। এখন অবশ্য প্রায় ধ্বংসস্তূপ হতে চলেছে।

"তারই ভেতর এ-ঘর ও-ঘর, এ-গলি ও-গলি দিয়ে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লালাজি।

"লালাজি অবশ্য যেতে যেতেই সে কথা আমায় জানিয়েছে। কোম্পানির সে এখন বিষনজরে পড়েছে। কুনওয়ারা সিংয়ের হারের পর কোম্পানির ফৌজ আর চরেরা সিংজির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব যাদের ছিল, নির্মম হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। লালা রাজারাম তাদের কাছে পয়লা নম্বর দুশমন। লালাজিকে তাই এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কোম্পানির হাতে ধরা পড়লেও সোনাদানা হীরা-জহরত নিয়ে তার বিপুল সম্পত্তি যাতে তাদের হাতে না পড়ে তাই লালাজি অনেক খুঁজে খুঁজে এই পুরনো মঞ্জিলের ধ্বংসস্তূপটা বার করে তার একটা গোপন কামরায় সেগুলো লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। নিজের ভাগ্যদোষে ধরা পড়লে বা মারা গেলেও এই বিপুল ঐশ্বর্য যাতে বেপাত্তা না হয়ে গিয়ে তার বিশ্বাসী ভাল একজনের কাজে লাগে তাই সে আমাকে সে গুপ্ত কামরাটা দেখিয়ে রাখবার জন্যে এনেছে।

"তা এনেছে, ভালই করেছে। কিন্তু সে কামরা আমায় দেখাবে কখন ? ঘরের পর ঘর, গলির পর গলি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, এই করতে করতে সব জায়গাটা আমার কাছে গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল মনে হচ্ছে যে! রাজারাম নিজে সে কামরা আবার চিনতে পারবে তো ?

"সে-প্রশ্নের জবাব যা পেলাম তা কল্পনাতীত। একটা বেশ লম্বা আবছা অন্ধকার ঘুলঘুলি দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে লালাজি হঠাৎ

আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কীরকম বিশ্রী অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, 'এইখানটায়! এইখানটায় আমি নিজেই তারপর হারিয়ে গেছি!'

"এই কথা কটা উচ্চারণের পরই সামনে থেকে সে এক নিমেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

" 'লালাজি! লালাজি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"তার জবাবে প্রথমে একটা বিকট হাসি সমস্ত বাড়িটার ভেতর দিয়ে যেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে গেল। তারপরই লালাজির বিদ্রূপে বাঁকা গলা, 'খোঁজো খোঁজো বাবুজি। সোনা চাঁদি, হীরা জহরতের বহুত লালচ তোমার দিলের মধ্যে কেমন? খোঁজো, খোঁজো তাহলে জান দিয়ে। আর কিছু না পারো, সেই লুকনো কামরায় হীরা জহরতের ওপর তোমার হাড্ডিগুলো হয়ত সাজানো থাকতে পারবে।'

" 'লালাজি! লালাজি!' আমি প্রায় ককিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'এসব তুমি কী বলছ? তুমি এপারের বদলে ওপারেই যদি গিয়ে থাকো তাহলেও আমার সঙ্গে বেইমানি কি তোমার সাজে? তোমার লুকনো দৌলতখানা আমি দেখতে চাই না, তুমি শুধু আমায় এ-গোলকধাঁধা থেকে বার হবার হদিশ বাতলে দাও। বাতলে দাও লালাজি।'

"উত্তরে আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

"পাগলের মত এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-গলি থেকে অন্য গলি তারপর ছুটে বেড়াতে লাগলাম। দেয়ালে চৌকাঠে ঠোকা লেগে, হাত-পা-মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তবু বার হবার রাস্তা পেলাম না।

"সত্যিই শেষ পর্যন্ত তা পাব না নাকি? এই অজানা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার কঙ্কাল চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে থাকবে নাকি?

"অস্থির উৎকণ্ঠায় আর-একবার ছুটে বার হবার চেষ্টা করতেই আলোটা দেখতে পেলাম।

"আলো! তার মানে তো নিশ্চয় মুক্তির উপায়!

"সেই আলোর রেখার দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। আলো পাছে আলেয়া হয়ে যায়, এই ভয়।

"তা হল না। একটা বাঁক ঘুরতেই আলোটা দেখতে পেলাম। বেশ লম্বা-চওড়া একটা ঘর। ঘরের মধ্যে এক কোণের দিকে দড়িতে বোনা দুটি ছোট চৌকি! তার একটিতে বসে এক প্রৌঢ় সরু লম্বা একটা খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর দড়িতে বোনা চৌকির পাশেই বেশ উঁচু মাটির পিলসুজের ওপর একটা প্রায় গোলাকার প্রদীপের মোটা কটা সলতে রেড়ির তেলের জোরেই বোধহয় জ্বলছে।

"ঘরটার ভেতর ঢুকে সেখানকার সরঞ্জাম আর অচেনা প্রৌঢ়টিকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

"প্রৌঢ় কিন্তু বিন্দুমাত্র না চমকে, চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামাবার সঙ্গে হাতের লম্বা খাতাটা মুড়ে আমাকেই রীতিমতো অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন, বাবুজি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আমার নাম হল মুনশি মুলুকচাঁদ।"

"আপনার নাম মুনশি মুলুকচাঁদ! আর আপনি এই গোলকধাঁধা-মঞ্জিলে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন!"

"কথাগুলো আমার গলা দিয়ে বার হয়নি। আমার চোখমুখের চেহারাতেই প্রকাশ পেল।

"মুনশি মুলুকচাঁদ তা ঠিকমতো বুঝে পাশের অন্য দড়ির চৌকিটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'বসুন বাবুজি, ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। আজ আপনার বহুত পরেশানি হয়েছে ঝুটমুট।"

"ঝুটমুট! এবার রাগের জ্বালায় আমার গলায় আবার কথা ফুটল, 'শুধু ঝুটমুট বললে কিছুই বলা হয় না মুনশি মুলুকচাঁদজি। কাউকে নিয়ে এরকম বিশ্রী তামাশা শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়, আর সে শয়তানি যে করেছে তার ঠিকানা এখন এপারের না ওপারের?'

"আমার এই কথা শুনে মুনশিজি বলেছিলেন, যাদের পেছনে ছুটে ছুটে অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এতদিনেও তাদের চিনলেন না?' "

মুনশিজি আর মেজকর্তার মধ্যে তারপর যা কথা হয়েছিল, এই বিবরণের শুরুতেই তা কিছুদূর পর্যন্ত দেওয়া আছে। মেজকর্তার নিজের জবানি গোড়া থেকে ধরবার জন্যে যেখানে তা কাটা হয়েছিল, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মেজকর্তার নিজের কথাতেই আবার বোনা যেতে পারে। মেজকর্তা কথায় কথায় লালা রাজারামের নামটা করায় 'লালা রাজারামের' বলে হেসেছিলেন মুলুকচাঁদ।

মেজকর্তা তাঁর খেরো খাতায় তারপর লিখেছেন, "মুনশিজির হাসির ধরনের একটু গরম হয়েই বললাম, 'হাসছেন কী? লালা রাজারাম কে তা আপনি জানেন?'

"তা একটু জানি বইকি!' একটু যেন চাপা বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন মুনশিজি।

"তাতেই আরও জ্বলে উঠে বললাম, 'জানেন, লালা রাজারামের কথার কী দাম! লোকে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের চেয়ে তাঁর কথায় বেশি বিশ্বাস করে।'

" 'করে নয়, করত।' বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ একটু মুচকি হেসে, 'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি যে, এপারের সঙ্গে ওপারের কোনো মিল নেই। এপারে যে ষোল আনা সাচ্চা ওপারে হামেশা সে আঠারো আনা ঝুটা হয়ে স্রেফ মজা করবার জন্যেও।'

"তা বলে লালা রাজারামও তাই হবে!' অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, 'এই দুদিন আগে দেশের জন্যে যিনি জান দিয়েছেন তাঁর এমন প্রবৃত্তি!'

"যদি বলি ওই জান দেওয়াটাও ঝুটা বাহাদুরি!' আগের মতোই মুখ টিপে হেসে বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ। 'লালাজি কুনওয়ারা সিংকে ছেড়ে কোম্পানিরই শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর জান নিয়েছে কোম্পানির ফৌজ নয়, তাঁর আগেই দলেরই লোক, বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।'

"কখ্খনো না। হতে পারে না! আমি প্রায় মারমুখো হয়ে বললাম, 'কী জানেন আপনি লালা রাজারামের বিষয়ে? কে আপনি?'

" 'আমি লালা রাজারামেরই মুনশি। তাই সব জানি।' গম্ভীর হয়ে বললেন মুনশিজি।

"মাথাটা প্রথমে গুলিয়ে গেলেও এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছি। তবু মুনশিজির মুখের দিকে না চেয়ে নিচের মেঝোতে প্রদীপের আলোর ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম 'আপনি লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন, তাই সব জানেন। কেমন মুনশিজি? আপনি লালাজিকে নিজের দলের সঙ্গে বেইমানি করবার জন্যে তাদের হাতে মরতে দেখেছেন, তারপর ওপারে গেলে সাচ্চারাও সব ঝুটা হয়ে যায় জেনে এখানে আমার মতো নিরীহ মানুষ যাতে লালাজির হাতে নাকাল না হয় তাই দেখবার জন্যে এখানে পাহারা-দার হয়ে বসে আছেন, এই তো আসল ব্যাপার! না মুনশিজি?'

"মুনশিজি এবার খুশি হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বলে গেলাম, 'আপনাকে কিছু আর বলতে হবে না মুনশিজি। আপনি যা করছেন তা অতি মহৎ কাজ। কিন্তু এপারের কারুর পক্ষে ওপারের কারুর ওপর পাহারাদারি করায় বেশ একটু ঝামেলা নেই কি?'

" 'তা আছে।' মুনশিজি স্বীকার না করে পারলেন না, 'তবে, মানে……'

"মুনশিজিকে আবার থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তবে আপনার নিঃস্বার্থ গরজটা বড় বেশি। লালা রাজারামের লুকনো দৌলতখানা যাতে যার-তার হাতে না পড়ে, তার জন্যে সব কিছু সহ্য করতে আপনি প্রস্তুত।'

" 'ঠিক ধরেছেন!' উৎফুল্ল হয়ে বললেন মুনশিজি।

"কিন্তু তার সঙ্গে আরও যা-যা ধরেছি, সেটাও তাহলে শুনুন।"

এবারে সোজা মুনশিজির মুখের ওপর চোখ রেখে বললাম, 'আপনি নিজে আর এপারের কেউ নন। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, আপনি শুধু লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন না, কোম্পানির চরও ছিলেন সেই সঙ্গে। আপনার কাছে গোপন খবর পেয়ে কোম্পানি রাজারামজিকে কুনওয়ারা সিংয়ের দলের বলে জেনে তাঁর আস্তানায় চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু তার আগে নিজের ধনদৌলত লুকোবার ব্যবস্থা করে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে লালাজি ভোলেননি। ওপারে

যাবার পর আপনার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, ওপারে গেলেই সবজান্তা হওয়া যায় না। তাই রাজারামজির লুকনো দৌলতখানার হদিশ আপনি পাচ্ছেন না। তা পাবার জন্যেই এখানে এসে এমন পাহারা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনি ডালে-ডালে বলেই রাজারামজিকে পাতায়-পাতায় যেতে হয়েছে। এতক্ষণে বুঝেছি, আপনাকে হদিশ না দেবার জন্যে আমার মতো দোস্তের সঙ্গেও বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন বিশ্রী চালাকি করতে হয়েছে। তবে যা তিনি করেছেন, তা একেবারে ঝুটমুট নয়। ওই বেয়াড়া রসিকতার ভেতর দিয়েই আমায় আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর লুকনো দৌলত উপযুক্ত হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। আমি সেই চেষ্টাই এবার করব। দেশের জন্যে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর দৌলত দেশের কাজেই যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ওপারের মিথ্যে ছায়াবাজি দিয়ে লালা রাজারামের লুকনো দৌলতখানা আপনার বংশের কারুর হাতে তুলে দেওয়ার আশা আপনার আর নেই।'

"মুনশি মুলুকচাঁদের ফ্যাকাশে মুখটা তখন প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেদিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি যে এপারের নন, সেটা প্রথম কী করে বুঝলাম, তাই ভাবছেন নিশ্চয়। একটা কথা তাহলে আপনাকে বলে যাই। ওপারের হয়ে এপারের সাজতে হলে কায়ার চেয়ে ছায়াটার দিকেই বেশি নজর রাখতে হয়। আপনি এমনিতে আজকের আসরটা ভালই সাজিয়েছিলেন। কিন্তু ধরিয়ে দিয়েছে আপনার ছায়াটা। প্রদীপের আলোয় আপনার ছায়াটা ঠিকমতো পড়তে না দেখেই আসল ফাঁকিটা ধরে ফেলে আর সব ব্যাপার আমি বুঝে নিয়েছি। ঠিক যে বুঝেছি, তা তো আপনার ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা নমস্কারটা তাহলে নিয়ে যান।'"

মেজকর্তার লেখা এখানেই শেষ। যা তিনি লিখে গেছেন, তা সত্য মিথ্যা যাই হোক, তাঁর নিজের হদিশ এবারে একটু দিয়ে ফেলেননি কি?

কনওয়ারা সিংয়ের তিনি নাম করেছেন। কুনওয়ারা সিং তো সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিহারের আরা জেলার কাছে তাঁর জগদীশ-পুরের রাজ্য থেকে কোম্পানির-বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

মেজকর্তা কি তাহলে সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার মানুষ? তাঁর খেরোখাতা আর-একটু ভাল করে ঘেঁটে দেখতে হবে।

———